শেখ মুজিব মামলা কেন অবৈধ ?

© স্যাল্টন রহমান ©

প্রচারে ঃ জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক ফোরাম, ঢাকা।

১৫ই আগস্টের সিড়ি বেঁয়ে ৭ই নভেম্বর জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সিপাহী জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লব

শেখ মুজিব মামলা কেন অবৈধ ?

◎ স্যাল্টন রহমান ◎

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সফল সামরিক অভ্যুত্থানে অপসারিত বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের, আদালত কর্তৃক মামলা গ্রহণ এবং সেই মামলার সূত্র ধরে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে অভিযুক্ত সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে সফল সামরিক অভ্যুত্থানের নায়কদের বিচারের কোন নজীর না থাকলেও বাংলাদেশে সেই নজীর স্থাপিত হয়েছে। দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থে সংঘটিত সফল বিপ্লবের নায়কদের হত্যা মামলার আসামী উল্লেখ করে বিচারের নামে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের এই আইন লংঘনের সুত্র ধরে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে গুরুত্বর সাংবিধানিক জটিলতা ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যা কিছু হয়েছিলো তা কি সাধারন অর্থে হত্যা ছিলো ? সফল সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনায় সংঘটিত হত্যাকান্ডকে কি হত্যা বলা যায় ? দেশ, জাতি ও জনগণের বৃহত্তম স্বার্থে সংঘটিত কোন হত্যাকান্ডের বিচার করার অবকাশ থাকতে পারে কি ? দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইনে তা কি সম্ভব ? সফল সামরিক অভ্যুত্থান কি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শুধু বাংলাদেশে হয়েছিলো, না আরো অনেক দেশে হয়েছিলো ? যে সব দেশে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছিলো সে সব দেশে অভ্যুত্থানের জন্য অভ্যুত্থানকারী নায়কদের পরে সিভিল বা সামরিক আদালতে বিচার করা হয়েছিলো ? না কোন দেশে কোন প্রকার বিচার করা হয়নি। সফল বিপ্লবের নায়কদের বিচার করা যায় না। কেননা বিপ্লব জনগণের সমর্থনেই সংঘটিত হয় কিংবা জনগণ বিপ্লব মেনে নিয়ে থাকেন। তাই সফল সামরিক অভ্যুত্থানের নায়কদের বিচার করার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন তোলা যায় না। কেননা বিপ্লব বিপ্লবই। বিপ্লবে যা যা ঘটে তা আপনা আপনিই আইনে পরিণত এবং আইনসিদ্ধ হয়। আর বিপ্লবের স্বার্থে সংঘটিত ঘটনাবলীকে আন্তর্জাতিক আইনের পরিভাষায় বলে Factum Valet, যার সার কথা হচ্ছে 'ক্যু ইজ ক্রাইম ইফ ইট ফেল্‌স'। সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রদোহীতার অভিযোগে বিচার হয়। কিন্তু সফল হলে বিচারের পথ থাকে না। সফল সামরিক অভ্যুত্থান ক্ষমতা ও আইনের উৎসে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক আইনের এই মেকসিম অনুসারে বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের

www.pathagar.com

'১৫ই আগস্ট সংঘটিত সফল সামরিক অভ্যুত্থানের নায়কদের বিচার করার অধিকার কোন সরকারের নেই। আগস্ট বিপ্লবের নায়কদের বিচার করে সরকার আইন-অসিদ্ধ (বিরুদ্ধে) কাজ করেছে ঃ যার পরিণতিতে বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দেবে।

আজ তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক আওয়ামী-বাকশালীরা ১৫ই আগস্ট মহামুক্তির মহান দিবস পালন না করে শোক দিবস পালন করছে। ১৫ই আগস্টের অবশ্যাম্ভাবিতাকে বিতর্কে পরিনত করতে চাচ্ছে। শেখ মুজিব মামলার নামে আদালতের মাধ্যমে বিপ্লবের নায়কদের হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। ১৫ই আগস্ট, ১৫ই আগস্টের ইতিহাস এবং তার তাৎপর্য আমাদের ইতিহাসে অম্লান। প্রচলিত অর্থেও ক্যু-দা-তা বলতে যা বুঝায়, ১৫ই আগস্ট সফল সামরিক অভ্যুত্থানকে কিছুতেই সে নামে অভিহিত করা যাবে না। ১৫ই আগস্ট বিপ্লব বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জনক। ১৫ই আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা, স্বার্ভভৌমত্ব ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার দেশপ্রেমিক আন্দোলন। যারা আজ ১৫ই আগস্ট বিপ্লবের নায়কদের আদালতের কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে, তারাই ১৫ই আগস্ট বিপ্লবের ঐতিহাসিক কর্মসুচীতে ছিলো এবং সমর্থন দিয়েছিলো। তারাই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে আহবান করেছিলো সফল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশের অসহায় গরীব জনগণকে দুঃশাসনের নাগপাশ থেকে রক্ষা করতে। আল্লাহ প্রদত্ত গজবেই সে দিন বাংলার ফেরাউন জাতীয় বিশ্বাসঘাতক শেখ মুজিবুর রহমানের দুঃশাসনের পতন ঘটেছিল। বিগত আওয়ামী সংসদের মাননীয় স্পীকার হুমায়ন রশীদ চৌধুরী আশির দশকে এরশাদ সরকারের পররাস্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে এক জনসভায় বলেছিলেন ঃ **"শেখ মুজিবকে যদি এক'শ বারও হত্যা করা হয়, তবুও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তখন শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা ছিল জাতীয় কর্তব্য।**"(সাপ্তাহিক সুগন্ধা, পৃঃ ২৫, ১/১১/৯৬ সংখ্যা) সত্যিকার অর্থে দেশ, জাতি ও জনগনের স্বার্থে স্বৈরাচারী খুনী মুজিববাদী আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসনের অবসান ঘটাতে একটি মহা বিপ্লবের দরকার ছিল। আর সেই বিপ্লব করার দায়িত্ব যথাযোগ্যভাবে পালন করেছে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী। ১৯৭৫-এ একদলীয় স্বৈরতন্ত্রী আওয়ামী-বাকশালের হত্যা-ধর্ষন-লুণ্ঠন-সন্ত্রাস-ছিনতাই-হাইজ্যাক-গুম-ব্যাংক ডাকাতি-পাটের গুদামে অগ্নি সংযোগ-কৃত্রিম দুভিক্ষ-সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ-বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ-মুনাফাখোরী-কালোবাজারী-মজুতদারীর রাজনীতির অবসানের জন্য ঐতিহাসিক ১৫ই আগস্টের মহান বিপ্লবী তৎপরতা সংঘটনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে সুমহান দায়িত্ব পালন করেছে তা দেশপ্রেমিক জনগণ চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করবে। সেদিন ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছিল তার জন্য ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের জনক, স্বাধীনতার রুপকার,স্বাধীনতা সফল স্থপতি, রাষ্ট্রপিতা মজলুম জননেতা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী "ঐতিহাসিক পদক্ষেপ" আখ্যায়িত করে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ১৬ই আগস্ট মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী বিপ্লবী সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এক বার্তা পাঠান সকল সংবাদপত্রে। দেশের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, নেতা এবং গণসংগঠনসমুহ দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনীকে তাদের সাহসী পদক্ষেপের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থান বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রদান করে একটা বিশেষ মর্যাদা। সৌদি আরবসহ সকল ইসলামী রাষ্ট্র ও বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাষ্টসমুহ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৫ই আগস্টের ঘঁটনা সমগ্র জাতির ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে

www.pathagar.com

দেয় অমংগলের পথ থেকে মংগলের পথে। বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে এই ধরনের ঘঁটনায় সব থেকে বড় বিচারক হচ্ছে জনগণ। বাংলাদেশের জনতার আদালতের বিচারে শেখ মুজিবের অপসারণ ছিলো একটি সফল বিপ্লব এবং এদেশের জনতা স্বঃস্ফুর্তভাবে ১৫ই আগস্টের পরিবর্তনকে মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে। দেশপ্রেমিক সাহসী নেতা সিরাজ সিকদারকে নির্মম নিষ্ঠুর পৈশাচিকভাবে হত্যার পরে জাতীয় সংসদের পবিত্র চত্তরে দাঁড়িয়ে -"কোথায় আজ সিরাজ সিকদার"-এ দম্ভোক্তি উচ্চারনকারী বাংলাদেশের একমাত্র আত্মস্বীকৃত খুনী শেখ মুজিবকে নিয়ে আজ যারা বাড়াবাড়ি ও নোংরা রাজনীতি করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃস্টির মাধ্যমে ফায়দা হাসিল করতে চান, তাদের অনুধাবন করা উচিত বাংলাদেশের জনগণের আদালতে শেখ মুজিব এবং শেখ মুজিব সংক্রান্ত সকল ঘঁটনার সুষ্ঠ বিচার সমাপ্ত হয়ে গেছে। সেই বিচারের রায় সম্পূর্ণ শেখ মুজিবের বিপক্ষে গেছে। ১৫ই আগস্টের সফল বিপ্লবে রক্ত কিছু ঝরেছিলো। কিন্তু তা ছিলো অবরুদ্ধ জাতির বন্দী আত্তাকে মুক্ত করার অভিযাত্রায় ইতিহাসের এক প্রসব যাতনা মাত্র। এ প্রসংগে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক আখতার-উল-আলম আগস্ট বিপ্লবের এক সমীক্ষায় বলেছেন, -কারো মতে ১৫ই আগস্টের ঘঁটনা নিছক একটি হত্যাকান্ড। কারো মতে হত্যাকাণ্ডের প্রয়োজন ছিলো না। কারো মতে এ অভ্যুত্থানে কিছু বাড়াবাড়ি ঘটেছিলো। কিন্তু **৭৫ এর ১৫ই আগস্টের ঘঁটনা-অভ্যুত্থান, যে কোন বিচারে এই অভ্যুত্থান ছিলো ঐতিহাসিক। যে কয়জন জানবাজ অফিসার ও সিপাহী এই অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ছিলো-তারা ছিলেন গোটা দেশবাসীর ইচ্ছার প্রতীক মাত্র। অভ্যুত্থানটি ছিলো জাতীয় সেই ইচ্ছারই প্রতিফলন। তাই এই অভ্যুত্থানকে যেমন দেশবাসী মেনে নিয়ে ছিলো তেমনি অভ্যুত্থানের ফলে যে সব ঘঁটনা সংঘটিত হয়ে ছিলো, ঘটে ছিলো যে সব মৃত্যু ও অপমৃত্যু তার জন্য দেশবাসীর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। অভ্যুত্থানের সফলতায় যে কোন অভ্যুত্থানের যর্থাথতা প্রমানের জন্য যথেস্ট। তাই এই সফল অভ্যুত্থানে সংঘটিত কোন মৃত্যুই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোন আইনেই হত্যাকান্ড বলে চিহ্নিত নয়।** সাবেক প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ 'দ্য মনিং সান' পত্রিকায় এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, -A Successful coup brings about a legal Government and it is an accepted rule that the winners in the coup. আজ আমাদের দেশের একদল বুদ্ধিজীবি বলছেন, ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থান ছিলো পাকিস্তানী ভাবধার দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু এই অভ্যুত্থান যারা ঘটিয়েছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা। যাঁরা যুদ্ধ করে ছিলেন বাংলাদেশকে স্বাধীন করবার জন্যে, যাঁরা চাননি বাংলাদেশ ভারতের একটি সামন্ত রাজ্যে পরিণত হোক, যারা চেয়েছিলেন-স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। এক সত্যিকারের স্বদেশপ্রেম কাজ করেছিলো তাদের মনে।

যে সব কাজ প্রচলিত আইনে করা যায় না, এমন কাজ কোন সরকারী কর্মচারী অথবা সেনা বাহিনীর লোক করে থাকলে তার জন্য আশ্রয় নেয়া হয়েছে ইনডেমনিটি বিল বা দায়মুক্তি অধ্যাদেশের। বিলেতের বিখ্যাত আইন গবেষক ও বিশেষজ্ঞ মিঃ ডাইসি বলেছেন : An Act of Indemnity, again, is also, it should be noted, itself a law.) ইনডেমনিটি এ্যাকট-এর মাধ্যমে একটি সরকার আপাত কাজকে বৈধতা প্রদান করতে পারে। এই রকম কাজকে আইনের স্বীকৃতি দান কোন প্রকারেই বে-আইনী কাজ নয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একটা দেশের পার্লামেন্ট বা আইন সভা তা অবশ্যই করতে পারে। এর দ্বারা আইনের কোন অমর্যাদা করা হয় না। বরং আইনের শাসনের মর্যাদাকেই বৃদ্ধি করা হয়। (A.V.Decey, law of the Constitution, P.233 eight edition 1975) সংবিধানের ৪৬ ও ৯৩ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের মহামান্য প্রেসিডেন্টকে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করার যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে সেই ক্ষমতার বলে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদ ২৬/০৯/৭৫ তারিখে ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারী করেন। ১৯৯৬ সালের ১২ই নভেম্বর জাতীয় সংসদে ২১ নম্বর আইন দ্বারা আওয়ামী লীগ সরকার ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ বাতিল ঘোষনা করেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে অপসারণের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদেরকে সিভিল আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করা যাবে কিনা - সে বিষয়ে সেনা আইনে কোন অসুবিধা আছে কিনা- তা জানানোর জন্য ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ গোলাম রসুল ১৯৫৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির (মিলিটারী অফেনডার্স) ২ নং বিধি মোতাবেক সেনাবাহিনী প্রধানকে গত ২৭/০৩/১৯৯৭ তারিখে নোটিশ প্রদান করেন। আদালতের নোর্টিশের প্রেক্ষিতে সেনা প্রধান লে ঃ জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান **(সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার আপন ফুফা)** ০২/০৪/১৯৯৭ তারিখে অত্র আদালতকে সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের বিষয়ে "নো অবজেকশন" সার্টিফিকেট প্রদান করেন। সেনা প্রধানের এই "নো অবজেকশন" সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে শেখ মুজিব মামলায় সেনা কর্মকর্তাদের বিচার পর্ব শুর হয়। সেনা প্রধান যে " নো অবজেকশন" সাটিফিকেট দিয়েছেন আদালতকে-এই সাটিফিকেট দেবার বিষয়ে সেনা প্রধানের কোন আইনগত অধিকার নেই সেনা আইনের বিধানে। সেনা আইনের ৯৪ ও ৯৫ ধারা লংঘন করে আদালতকে "নো অবজেকশন" সার্টিফিকেট দেয়ার অধিকার সেনা প্রধানের নেই। সেনা বাহিনীতে চাকুরী করাকালীন সময়ে কোন কর্মকর্তা বা সদস্য কোন অপরাধ করে থাকলে তার বিরুদ্ধে সেনা আইনে শাস্তিমূলক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেনা বাহিনীতে চাকুরীরত অবস্থায় কেউ কোন অপরাধ করে থাকলে তার বিচার হয় সামরিক আদালতে ঃ অবশ্যই কোন বেসামরিক আদালতে নয়। ১৫ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের বাকশাল সরকারকে উৎখাত করার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে কিংবা ১৫ই আগস্ট সেনা হেড কোয়া-র্টার থেকে যে দায়িত্ব কর্মকর্তাদের দেয়া হয়েছিল-তা পালন না করার অভিযোগে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সেনা আইনে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল ? শেখ মুজিব মামলায় যে সব সেনা কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদের কাউকেই সেনা শৃংখলা ভংগের (১৫ই আগস্ট ঘটনায় জড়িত থাকার কারণে) অভিযোগে সামরিক আদালতে বিচার করা হয়নি। মুজিব উৎখাত পর্বে যদি কর্মরত কোন সেনা কর্মকর্তা জড়িত থাকতেন তাহলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনগত পদক্ষেপ সেনা বাহিনী নিতো। যেহেতু সেনা বাহিনীর কোন কর্মরত কোন কর্মকর্তা ১৫ই আগস্ট হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত নয়- সেহেতু আইনগত কোন পদক্ষেপ সেনা বাহিনী নেয়নি। আর যদি কারো বিরুদ্ধে মুজিববাদী বাকশাল সরকার উৎখাত পর্বে জড়িত থাকার অভিযোগে ব্যাবস্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে তারা অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যাক্তিরা নন-অন্য কেউ। যদি তদন্তে দেখা যায় যে, বাকশাল সরকারের উৎখাতের সাথে জড়িত কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে সেনা শৃংখলা ভংগের অভিযোগে বিচার করা হয়নি-তাহলে এটা পরিস্কার যে, গোটা

www.pathagar.com

সেনা বাহিনীই শেখ মুজিবের আওয়ামী-বাকশালী সরকার উৎখাতের সাথে জড়িত ছিল। কাজেই শেখ মুজিব বিষয়ক মামলায় কারো বিচার করতে হলে অবশ্যই তৎকালীন সময়ে কর্মরত সকল সেনা কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করে বিচার করতে হবে। মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রাপ্ত ব্যাক্তিদের মধ্যে লেঃ কর্ণেল (অবঃ) সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম (বীর উত্তম), লেঃ কর্ণেল (অবঃ) নুর চৌধুরী ও মেজর (অবঃ) রাশেদ চৌধুরী ছাড়া আর সবাই ঘটনার সময় সেনা বাহিনীতে চাকুরীরত। (১৫ই আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে বাকশাল সরকারের উৎখাত সাধিত হওয়ার পরে যে সরকার গঠিত হয়, সেই সরকার উল্লেখিত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে বাকশাল সরকারের আরোপিত বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।) শেখ মুজিব মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল (অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান, কর্ণেল (অবঃ) খন্দকার আব্দুর রশিদ, কর্ণেল (অবঃ) মহিউদ্দিন আহমদ, কর্ণেল (অবঃ) আজিজ পাশা, মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা, মেজর (অবঃ) শরিফুল হোসেন, মেজর (অবঃ) মহিউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন (অবঃ) কিসমত, ক্যাপ্টেন নাজমূল আনসার, ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদ, ক্যাপ্টেন মসলেহ উদ্দিন আহমাদ, ক্যাপ্টেন আব্দুল ওহাব জোয়ার্দ্দার, দফাদার মারফত আলী, এল ডি হাসেম মৃধাকে সেনা আইনে কোন প্রকার শাস্তি কিংবা ১৫ই আগস্ট হত্যাকান্ডের সাথে সম্পর্ক ছিল সন্দেহে তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে- এ রকম তথ্য প্রমান কারো হাতে নেই। যেহেতু মুজিব মামলায় অভিযুক্ত ১৪ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সেনা শৃংখলা ভংগের অভিযোগ তোলা হয়নি তাদের চাকুরীকালীন সময়ে, সেহেতু তাদের চাকুরীকালীন সময়ের কোন এক সময়ে বে-সামরিক এলাকায় সংঘটিত একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত করা যায় কি যায় না সে বিষয়ে উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার ছিল। অথচ সেনা প্রধান এ বিষয়ে উচ্চতর আদালতের মতামত গ্রহণ না করেই ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ জনাব গোলাম রসুলকে "নো অবজেকশন" সার্টিফিকেট দিয়েছেন মুজিব মামলায় অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, সেনা প্রধান "নো অবজেকশন" সার্টিফিকেট দিতে পারতেন ১৫ই আগস্ট ৭৫ এর পূর্বে যারা অবসরপ্রাপ্ত বা বহিস্কৃত হয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায়। সেনা আইনে যাদেরকে মুজিব হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি চাকুরীকালীন সময়ে, সেই তাদেরকেই মুজিব মামলায় অভিযুক্ত করে বিচার করার অনুমতি বে-সামরিক আদালতকে প্রদান করে সেনা প্রধান সামরিক আইন ও সেনা আইনের চরম লংঘন করেছেন। সামরিক আইন ও সেনা আইন লংঘনের কারনে সেনা প্রধান লে ঃ জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান (সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার আপন ফুফা)-এর অবশ্যই বিচার হওয়া উচিৎ। যে সেনা বাহিনী ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের নায়কদের কর্মকান্ডকে বৈধতা দেবার জন্য সামরিক আইন জারি করেছিল সারা দেশে, সেই সেনা বাহিনী আজ সেই সামরিক আইন জারির কথা অস্বীকার করতে পারে না সেনা আইনের সাংবিধানিক ধারায়। অথচ সেনা প্রধান আদালতকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিয়ে সেই কাজটি করেছেন। সামরিক আইন জারী হবার পরে সামরিক আইনের ছত্রছায়ায় ১৫ই আগস্ট বাকশাল সরকারের উৎখাত হয়নি বলে যে দাবী করা হয়েছে মুজিব মামলার রায় ঘোষণায়-তা গ্রহন যোগ্য হবে কি হবে না সে সব নির্ধারণ করবেন মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা ১৬ ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, ২৬ শে মার্চ জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস ও ২১ শে ফেব্রুয়ারী আন্ত র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-সহ অন্যান্য জাতীয় দিবস পালন করতে গেলে রাত ১২ টা ১ মিনিট

www.pathagar.com

থেকে কর্মকান্ড শুরু করি। ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব সরকার অপসারিত হওয়ার অনেক পূর্বেই সামরিক শাসন জারী করা হয়েছিল। আর এই সামরিক শাসন জারীর ঘোষণা রেডিও মারফত প্রচার করা হয় ১৫ই আগস্ট ভোরে। ১৫ই আগস্ট ভোরে রেডিও মারফত সামরিক শাসন জারীর যে ঘোষণা দেন মেজর ডালিম, এই ঘোষণায় বলা হয় যে, স্বৈরাচারী মুজিবকে উৎখাত করা হয়েছে;সারা দেশে সামরিক শাসন জারী করা হয়েছে। -মেজর ডালিমের এই ঘোষণা কিন্তু সামরিক শাসন জারীর ঘোষণা নয়। দেশে যে সামরিক শাসন জারী করা হয়েছে সেই কথাই মেজর ডালিম ১৫ই আগস্ট রেডিও-এর ঘোষণায় বলেছেন। যেহেতু মেজর ডালিমের ঘোষণায় "দেশে সামরিক শাসন জারী করা হয়েছে" বলা হয়েছে, সেহেতু একথা দিবালোকের মত পরিস্কার যে, দেশে ১৫ই আগস্টের পূর্বেই সামরিক শাসন জারী করা হয়েছিল। ১৫ই আগস্ট ভোরে তা শুধু দেশবাসীকে জানানো হয়েছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ক্রান্তিকালীন ও অস্হায়ী বিধানাবলীসমূহের মধ্যে ৩ক। (১) বিধানে (কতিপয় ফরমান বৈধকরণ ইত্যাদি) এ বলা হয়েছে- ১৯৭৫ সালের ২০ শে আগস্ট এবং ৮ ই নভেম্বরের ফরমানসমূহ ও ১৯৭৬ সালের ২৯ শে নভেম্বরের তৃতীয় ফরমান, এবং উহাদের সংশোধনকারী বা সম্পূরক অন্যান্য সকল ফরমান ও আদেশ, অতঃপর যাহা এই অনুচ্ছেদে সমষ্টিগতভাবে উক্ত ফরমানসমূহ বলিয়া উল্লেখিত, এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে উক্ত ফরমানসমূহ বাতিল ও সামরিক আইন প্রত্যাহার করিবার তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে, অতঃপর যাহা এই অনুচ্ছেদে উক্ত সময় বলিয়া উল্লেখিত, প্রণীত সকল সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ এবং অন্যান্য আইন বৈধরুপে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে অথবা উহাদের নিকট, কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উথাপন করা যাইবে না।

প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদ কর্তৃক জারীকৃত ও স্বাক্ষরিত ২০ শে আগস্ট ৭৫ এর ফরমানটির আইনগত বৈধতা দেয়া হয়েছে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ৩ক। (১) বিধানে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ৩ক। (১) বিধানে ২০ শে আগস্টের ফরমান সম্পর্কে কোন আদালতে বা ট্রাইব্যুনালে অথবা তাদের নিকট কোন কারনেই কোন প্রশ্ন উথাপন করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ৩ক। (১) বিধান যতদিন বাতিল কিংবা সংশোধন করা না হবে তত দিন পর্যন্ত ২০ শে আগস্টের ফরমান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কোন আদালতে তোলা যাবে না।

কিন্তু আমরা শেখ মুজিব মামলার রায়ে কি দেখছি ? ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ জনাব গোলাম রসুল শেখ মুজিব মামলার রায় ঘোষণায় ২০ শে আগস্ট ৭৫ প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদ কর্তৃক জারীকৃত ও স্বাক্ষরিত ফরমান সম্পর্কে বাংলাদেশের উচ্চতর আদালতের কিছু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উচ্চতর আদালত ২০ শে আগস্টের ফরমান সম্পর্কে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, সেই আলেচনা ও সিদ্ধান্ত ঘোষণার অধিকার সাংবিধানিকভাবে উচ্চতর আদালতের আছে কি ? অবশ্য বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ৩ক। (১) বিধানের কার্য

www.pathagar.com

ক্ষমতাবলে উচ্চতর আদালত কেন বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট সহ কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের থাকার কথা নয়। যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ৩ক (১) বিধানের কার্যক্ষমতা বলে ২০ শে আগস্ট ৭৫ এর ফরমান সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না কিংবা কোন আদালত-ও এ ফরমান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার রাখে না, সেহেতু উচ্চতর আদালত ২০ শে আগস্ট ৭৫ এর ফরমান সম্পর্কে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে তা অসাংবিধানিক, অবৈধ এবং সংবিধান লংঘন।

অবশ্য উচ্চ আদালত ১৯৭৫ সালের ২০ শে আগস্ট জারীকৃত ফরমান সম্পর্কে আ-দৌ কিছু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত দিয়েছে বলে মেনে নেয়া উচিত কি উচিত নয় তা বিবেচনা করা দরকার। উচ্চ আদালত ২০ শে আগস্টের ফরমান সম্পর্কে যে আলোচনা করেছে ও সিদ্ধান্ত দিয়েছে সে সম্পর্কে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালত মুজিব মামলার রায়ে কোন প্রকার তথ্য প্রমান উল্লেখ করেননি। ২০ শে আগস্ট ৭৫ এর ফরমান সম্পর্কে কে বা কারা কোন্ তারিখে উচ্চ আদালতে সিদ্ধান্ত চেয়ে আবেদন করেছে তার কোন বিবরণ বা সূত্র মুজিব মামলার রায়ের কোথাও উল্লেখ নেই। উচ্চ আদালতের নামে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্ন আদালতের রায়ে তুলে ধরা হয়েছে সেই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত কোন সালের কোন তারিখে মাননীয় উচ্চ আদালত দিয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই। ২০ শে আগস্ট ৭৫ এর ফরমান সম্পর্কে উচ্চ আদালতের কিছু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত বলে যে বক্তব্য ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ মুজিব মামলার রায়ে লিপিবদ্ধ করেছে তা উচ্চ আদালতের বক্তব্য নয় বলে ধরে নেয়া আইনের দৃস্টিতে গ্রহণ যোগ্য। কেননা আইনের চোখে তথ্য প্রমান ছাড়া আবেগী যুক্তি বিশ্বাস যোগ্য নয়। এখানে তথ্য প্রমানের দারুন অভাব রয়েছে।

যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে সামরিক আইন জারী করা হোক না কেন তা সব সময়ই বৈধ। পাকিস্তানী আমল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সকল সামরিক আইনের ফরমানই বৈধ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। সামরিক আইন জারীর পর কেউ এর বৈধতা সম্পর্কে উচ্চতর আদালতে কোন প্রকার প্রশ্ন তোলেনি। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট তার একা-ধিক রায়ে সংবিধানের পাশাপাশি সামরিক আইন এবং সেই আইনের অধীনে জারীকৃত ফরমান বা অধ্যাদেশসমূহকে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদায় বৈধতা দিয়েছেন। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত ৮ম জাতীয় সংবিধান সংশোধনী মামলার রায়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তৎকালীন সময়ের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দীন আহমাদ বলেছেন, "১৯৭৫ সালের সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ধ্বংস করে সংবিধানে এ সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু সংবিধান পুরুজ্জীবনের পর তা নিয়ে কেউ আদালতে চ্যালেন্ম জানাতে আসেনি। এর ফলে এ সব পরিবর্তন জনগণ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং তাদের মৌন সম্মতিক্রমে তা সংবিধানের অংশে পরিণত হয়েছে।"
বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী সাড়া জাগানো হালিমা খাতুন মামলার রায়ে ১৯৭৫ সালের সামরিক আইন জারীকে 'ডকট্রিন অব স্টেট নেসেসিটি'র আলোকে শুধু সাংবিধানিক বিচ্যুতি' হিসাবে দেখেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ১৯৫৮ অথবা ১৯৬৯ সালের সামরিক আইন থেকে এই সামরিক আইন সম্পূর্ণরুপে পৃথক। কারণ সংবিধান স্থগিত করা হয়নি। শুধু মাত্র প্রয়োজনের

www.pathagar.com

নিরিখে এর কিছু অংশ সামরিক ফরমানের আওতায় আনা হয়েছে। -বিচারপতি জনাব মোস্তফা কামাল ১৯৯৪ সালে লিখেছেন ঃ "এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তা আমি জানি না, তবে বিপ্লবের বৈধতায় কেলসন তত্ত্ব "-এর প্রয়োগ অথবা স্টেট নেসেসিটি বাংলাদেশের সামরিক আইন পর্যালেচনার ক্ষেত্রে কোন ভাবেই পরখ করে দেখার সুযোগ আদালতের কাছে আসেনি। -**"বিপ্লব মানেই সফল বিপ্লব"** -১৯২৫ সালের ট্যান্স কেলসন এই তথ্য দেন। এর সোজা অর্থ হচ্ছে-সফল বিপ্লবের জন্য সংবিধান বা কোন কিছুই বাঁধা নয়। অন্য দিকে 'স্টেট নেসেসিটি'র সরল যুক্তি হলো-রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও জাতীয় স্বার্থ যখন বড় হয়ে দেখা দেয়, তখন সংবিধান থেকে আংশিক বিচ্যুতি ঘটলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ সংবিধানের নামে জনগণ নিশ্চিহ্ন হতে পারে না। পাকিস্তান সুপীম কোর্ট এ দু'টো প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই অনুসরণ করেছে এবং তার ফলাফল-এ চমৎকারীত্ব ও বিদ্যমান। ১৯৫৮ সালে দোসো মামলায় ইসকান্দার মীর্জা সুচীত আইয়ুব-ইয়াহিয়া সামরিক শাসনকে 'সফল বিপ্লবের ফলপ্রসু' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এর ১৪ বছর পর ১৯৭২ সালে পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট আসমা জিলানী মামলায় জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখলকে বৈধ বলা হয়। ১৯৭৭ সালে বেগম নুসরত ভুট্টো এই মামলাকে ভিত্তি করে জেনারেল জিয়াউল হকের ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু এ মামলায় বিচারকরা সর্বসম্মতভাবে জিয়াউল হকের ক্ষমতা দখলকে বৈধ ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট যে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় সেই সামরিক অভ্যুত্থানে যে গোটা সেনাবাহিনীর প্রকাশ্য / অপ্রকাশ্য সমর্থন ছিল তার প্রমান মেলে শেখ মুজিব মামলার রায়ে মাননীয় বিচারক গোলাম রসুলের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কিত একটি বক্তব্যে। তিনি বলেছেন ঃ 'প্রাসংগিকভাবে ইহা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না যে, এই মামলায় প্রাপ্ত স্বাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ বিশেষ করিয়া যাহারা ঢাকায় অবস্থান করিতে-ছিলেন, তাহারা তাহাদের দায়িত্ব পালন করেন নাই, এমনকি পালনের কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নাই যথেষ্ট সময় পাওয়া সত্ত্বেও। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বংগবন্ধুর টেলিফোন পাওয়ার পরও তাহার নিরাপত্তার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। স্বাক্ষ্য-প্রমানে ইহা পরিস্কার যে, মাত্র দুইটি রেজিমেন্টের খুবই অল্প সংখ্যক জুনিয়র অফিসার/সদস্য এই হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কেন এই কতিপয় সেনা সদস্যকে নিয়ন্ত্রণ বা নিরস্ত্র করার চেস্টা করে নাই তাহা বোধগম্য নয়। ইহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সেনাবাহিনীর জন্য একটি চিরস্থায়ী কলংক হিসাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।' -বিচারক গোলাম রসুল তার এই বক্তব্যে একটি বিষয় পরিস্কার করেছেন যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ইচ্ছা করলেই শেখ মুজিবের মৃত্যু ঠেকাতে পারতো। যেহেতু বিচারক গোলাম রসুলের মতে, সেনা বাহিনী ইচ্ছা করলেই শেখ মুজিবের মৃত্যু ঠেকাতে পারতো, কিন্তু যথেস্ট সময় পাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ সেনা বাহিনী তা করেনি, সেহেতু দেশবাসী মনে করে এবং বিশ্বাসও করে মুজিব হত্যাকান্ড ও স্বৈরাচারী বাকশাল সরকার উৎখাতে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর ভূমিকা মুখ্য ছিল। শুধু তাই নয়, আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনা বাহিনী ১৫ই আগস্ট ঘ-ট-নার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেনি কিংবা ১৫ই আগস্টের ঘ-ট-নায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখেনি। শেখ মুজিবের মৃত্যু প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়ার পরও

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার ঘটনাকে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সেনা বাহিনীর জন্য একটি চিরস্থায়ী কলংক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বলে বিচারক গোলাম রসুল যে রায় দিয়েছেন তা দেবার আইনগত ও সাংবিধানিক অধিকার কোন মতেই বাংলাদেশের কোন বিচারককে দেয়া হয়নি। ১৫ই আগস্ট দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনীর জন্য কোন প্রকারের কলংক নয়। যদি ১৫ই আগস্ট সেনা বাহিনীর কলংক হতো, তাহলে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদ জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণের কিছু অংশের প্রতিবাদ সেনা বাহিনী করত এবং রেডিওতে সামরিক শাসন জারী করা হয়েছে বলে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তারও প্রতিবাদ করত। কিন্তু সেনা বাহিনী কোন প্রকার প্রতিবাদ করেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন ঃ "দেশের শাসন ব্যাবস্থার পরিবর্তন সর্বমহলের কাম্য হওয়া সত্ত্বেও বিধান অনুযায়ী তা সম্ভব না হওয়ায় সরকার পরিবর্তনের জন্য সামরিক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী পরম নিষ্ঠার সংগে তাদের দায়িত্ব সম্পুর্ণ করে দেশবাসীর সামনে সম্ভাবনার এক স্বর্ণদ্বার উম্মোচন করেছেন।" -"বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য"-শিরোনামের বইতে বিশিষ্ট আইনজীবি গাজী শামছুর রহমান সামরিক আইন ও সংবিধান সম্পর্কে বলেছেন ঃ ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ তারিখের ক্যু-দে-তার সংগে সংগে সারাদেশে সামরিক আইন জারী হয়। নুতন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদ একটি মন্ত্রীসভা নিয়োগ করেন। দেশের আইন শৃংখলা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামলাইবার চেষ্টা করিতে থাকে সামরিক বাহিনী। ২০ শে আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে পরিবর্তিত অবস্থাকে বিধিসম্মত করার জন্য প্রেসিডেন্ট একটি ঘোষণা জারী করেন। (বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য ঃপৃঃ১১২৯)

সাংবিধানিকভাবে সরকার উৎখাতের কোন বিকল্প পথ না থাকার কারনেই অসাংবিধানিক পথেই সরকার উৎখাত সাধিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিপ্লব সংঘটিত হয়। আর এই বিপ্লব হয় গণঅভ্যুত্থান কিংবা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। বাংলাদেশেও সে রকম বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। আমাদের যে সংবিধান আছে সেই সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে অপসারণের কোন সুনির্দিষ্ট পথ খোলা রাখা হয়নি। সত্যিই কি প্রেসিডেন্টকে সাংবিধানিক ভাবে অপসারণের কোন পথ খোলা রাখা হয়নি আমাদের জাতীয় সংবিধানে ? এ বিষয়ে আমাদের সংবিধানে কি বলা আছে তা আমরা আলোকপাত করতে পারি। মূলতঃ ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সবচেয়ে গৌরবোজ্বল ভূমিকা রাখে।

সংবিধানের ৫৩(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ এই সংবিধান লংঘন বা গুরুত্বর অসদাচরণের অভিযোগে রাস্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে ; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে অনুরুপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবে নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে ; স্পীকারের নিকট হইতে অনুরুপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পুর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার সংসদ আহবান করিবেন।' বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৩(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ 'অভিযোগ বিবেচনার পর

www.pathagar.com

মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাস্ট্রপতির পদ শুন্য হইবে।'

জাতীয় সংবিধানের ৫৩(১) ও (৪) অনুচ্ছেদের বিধান মতে প্রেসিডেন্টকে অপসারণের ব্যাবস্থা রয়েছে। এখন এই ব্যাবস্থা আ-দৌ-ও সাংবিধানিকভাবে কার্যকর করা যাবে কি যাবে না সে বিষয়ে জাতীয় সাংবাদিক ও সংবিধান গবেষক জনাব মনসুর আজীমের বক্তব্য তুলে ধরছি। "সংবিধানের অসংগতি" নামক পুস্তকে মুনসুর আজীম বলেছেন ঃ নিয়মতান্তিক উপায়ে প্রেসিডেন্টকে অপসারণের জন্য বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৩(১) ও (৪) অনুচ্ছেদ গণতান্তিক সদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু হলে কি হবে ? বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৩ (১) ও (৪) অনুচ্ছেদের কর্ম-ক্ষমতা সংবিধানের ৭২(১) এবং ১২৩ (৩)-খ অনুচ্ছেদে খর্ব করা হয়েছে। ৭২(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-ঃ সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রেসিডেন্ট সংসদ আহবান, স্থগিত ও ভংগ করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে প্রেসিডেন্ট প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বছর সংসদের অন্ততঃদুইটি অধিবেশন হইবে। ১২৩(৩)-খ অনুচ্ছেদে মেয়াদ অবসান ব্যাতিত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে, ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রাখা হইয়াছে।

সংবিধানের ৫৩(১) ও (৪) অনুচ্ছেদ মতে সংসদ সদস্যরা যদি প্রেসিডেন্টকে অভিশংসনের জন্য নিয়মতান্তিক পহ্নায় অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি-লগ্নে প্রেসিডেন্ট তাঁর কেন্দ্রীভূত সাংবিধানিক ক্ষমতা ৭২(১) অনুচ্ছেদ মতে পুনঃপুনঃ দু'বার সংসদ আহবান ও সংসদ ভেংগে দিয়ে ১২৩ (৩)-খ অনুচ্ছেদ মতে সংসদের পুনঃ নির্বাচন ঘোষণা করেন তাহলে প্রেসিডেন্টকে অভিশংসনের জন্য সংসদ সদস্যদের কি করণীয় আছে তা সংবিধানে তার কোন সুনিদৃষ্ট গ্যারান্টি নেই। এই অসংগতির কারণেই বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন দিন কোন প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন করা হয়নি যা অন্যান্য কারণ-গুলির মধ্যে অন্যতম। অন্য যে পন্থায় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টগণ অতীতে অপসারিত হয়েছেন তা একবার-ও সংবিধান সম্মত হয়নি। (সংবিধানের অসংগতিঃপৃঃ২৬ ও ২৭)।

আমাদের সংবিধানে প্রেসিডেন্টকে অপসারনের কোন পথ সুনির্দিস্টভাবে না থাকার কারণেই তৎকালীন বাকশাল সরকারের সংসদ সদস্যরা দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনীর সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে মুজিববাদী সরকারের কবর রচনা করেন। এ ছাড়া তাদের আর কোন পথ নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ছিল না। যদি থাকতো তাহলে সেনা বাহিনীর সমর্থনে সরকার পরিবর্তন করার চেষ্টা করতো না। মুজিবের দুঃশাসনের হাত থেকে দেশ, জাতি ও জনগণকে বাচাঁনোর জন্যই সংসদ সদস্যরা বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমাদের নেতৃত্বে ১৫ই আগস্টের মহা পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেদিন মুজিববাদী দুঃশাসনের অবশান বা উৎখাত পরিকল্পনায় বাকশাল সদস্যরা যে জড়িত ছিলেন তার বড় প্রমাণ হচ্ছে-মুজিব উৎখাত হওয়ার পর বাকশাল সরকারের সদস্যদের নিয়েই ১৫ই আগস্ট পরবর্তি সরকার গঠন করা হয়েছিল। বাকশাল সরকারের ১৮জন মন্ত্রীর ১০ জন এবং ৯ জন প্রতিমন্ত্রীর ৮ জনই মোশতাক সরকারে যোগদান করেছিলেন আগস্ট বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে। মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ ঃ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী, ফণিভূষণ মজুমদার, মোঃ সোহরাব হোসেন,

www.pathagar.com

আব্দুল মান্নান, মনরনজন ধর, মোঃ আব্দুল মোমেন, মোঃ আসাদুজ্জামান খান, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী। প্রতিমন্ত্রী ঃ শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, দেওয়ান ফরিদ গাজী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, অধ্যাপক নুরূল ইসলাম, নুরুল ইসলাম মুনজুর, কে এম ওবায়দুর রহমান, মোসলেম উদ্দিন খান, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, ক্ষিতিশচন্দ্র মন্ডল, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মোমিন উদ্দিন আহমেদ। সেনা আইন জারী করে মুজিববাদী সরকারের উৎখাত সাধনের পর সেনা কর্মকর্তারা ইচ্ছা করলেই নিজেরাই রাস্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হতে পারতেন। কিন্তু তারা তা না করে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতেই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন। এতে আরো একটি বিষয় পরিস্কার যে, বাংলাদেশ সেনা বাহিনী দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। দেশবাসী ও দেশপ্রেমিক আওয়ামী-বাকশালী নেতারা মুজিবের উৎখাতে সেনাবাহিনীর সাহায্য-সহযোগিতা চেয়েছিলেন বলেই সামরিক আইন জারীর মাধ্যমে ১৫ই আগস্ট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। সকল দেশের সকল সেনাবাহিনীর আইনগত অধিকার আছে সামরিক আইন জারী করার। তাই মুজিব উৎখাত পর্ব শুরু হয় সামরিক আইন জারীর কার্য-ক্ষমতা বলে। যেহেতু দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনী সামরিক আইন জারী করে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ স্বৈরাচারী মুজিববাদী বাকশালী সরকারকে উৎখাত করেছে, সেহেতু সেই উৎখাত পর্বে কেউ নিহত হয়ে থাকলে তা সাংবিধানিক ভাবে বৈধতা লাভ করেছে। ১৫ই আগস্ট বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়, সেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে গদী-নসীন হন মুজিব সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী (বাণিজ্যমন্ত্রী) জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমাদ ও বাকশালের এম পি'রা । অনেকে মোশতাক আহমাদের প্রেসিডেন্ট হওয়া এবং আগস্ট পরবর্তী সরকারকে অবৈধ বলে দাবী করে থাকেন। তাদের এই দাবী কতটুকু যুক্তিসংগত এবং গ্রহণ-যোগ্য তা বিবেচনা করতে হলে আগে দেখতে হবে এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় সংবিধানে কি বলা হয়েছে। সংবিধানের ১, ২, ৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-"মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাস্ট্রপতির পদ শূণ্য হইবার (৯০ দিনের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত) একশত আশি দিনের মধ্যে তা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।- "কিন্তু নির্বাচন ছাড়াই সংবিধান লংঘন করে অসময়ে কেউ যদি রাস্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হয় তাহলে তা বৈধ না অবৈধ এবং এই পরিস্থিতি থেকে সংবিধান বা গণতন্ত্র কিরুপে রক্ষা করা যেতে পারে তার কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা সংবিধানের কোথাও বর্ণিত নেই। সংবিধানে এ বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদের অভাব দেশবাসী অনুভব করছে প্রতিনিয়ত।" (সংবিধানের অসংগতি ঃ পৃ ঃ ৩১/৩২)

আমাদের জাতীয় সংবিধান লংঘন করে কেউ প্রেসিডেন্ট হলে তা বৈধ বা অবৈধ হবে কি হবে না সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা না থাকার কারণে কেউ প্রেসিডেন্ট হলে এবং তা যদি বাংলাদেশের তিন বাহিনী প্রধানসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ এবং জনগণ মেনে নেয় তাহলে তা অবশ্যই বৈধ বলে বিবেচিত হবে। মেজর ডালিম ১৫ই আগস্ট ভোরে রেডিও এর ঘোষণায় দেশে সামরিক আইন জারী, মুজিববাদী বাকশাল সরকারের উৎখাত এবং খন্দকার মোস্তাক আহমাদকে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। আওয়ামী সিনিয়র জননেতা খন্দকার মোশতাক আহমাদ এবং তার সরকারের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ, রিয়ার এডমিরাল এম, এইচ, খান, এয়ার ভাইস মার্শাল এ, কে খন্দকার,

www.pathagar.com

বি, ডি, আর প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান, পুলিশ প্রধান নুরুল ইসলাম, রক্ষী বাহিনীর (মহাপরিচালক বিদেশে থাকার কারণে) ভারপ্রাপ্ত প্রধান স্ব স্ব কণ্ঠে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ১৫ই আগস্ট ৭৫ এ। কাজেই আইনগত ভাবে খন্দকার মোশতাক আহমাদ প্রেসিডেন্ট হিসাবে বৈধতা লাভ করেছেন। খন্দকার মোশতাক আহমাদের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ বৈধ কি অবৈধ সে সম্পর্কে বিশিষ্ট আইন বিশারদ ও সংবিধান গবেষক জনাব গাজী শামছুর রহমান বলেছেন ঃ "মোশতাক আহমাদ সামরিক আইন জারী করেন, কিন্তু সংবিধান অক্ষুন্ন রাখেন। অবশ্য তিনি প্রেসিডেন্ট হন বিধি বর্হিভূর্ত অর্থাৎ বৈপ্লবিক পন্থায়। তাহা তিনি বিধি সম্মত রাখেন ঘোষণার মাধ্যমে। তিনি জাতীয় সংসদ বাতিল করেন নাই, একদলীয় ব্যবস্হা বাকশাল বাতিল করেন নাই। খন্দকার মোশতাক আহমাদ এক ঘোষণায় সূপীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে পেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।" (বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য ঃ পৃঃ১১২৯)

১৫ই আগস্ট দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনীর নেতৃত্বে সংঘটিত সরকার উৎখাত পর্বে সেনা বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা মেজর ডালিম (বীর উত্তম), মেজর নুর চৌধুরী, মেজর রাশেদ চৌধুরী, কর্ণেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী, ফণিভূষণ মজুমদার, মোঃ সোহরাব হোসেন, আব্দুল মান্নান, মনরনজন ধর, মোঃ আব্দুল মোমেন, মোঃ আসাদুজ্জামান খান, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, দেওয়ান ফরিদ গাজী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম মুনজুর, কে এম ওবায়দুর রহমান, মোসলেম উদ্দিন খান, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, ক্ষিতিশচন্দ্র মন্ডল, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মোমিন উদ্দিন আহমেদসহ আওয়ামী-বাকশালী অনেক নেতা জড়িত ছিলেন। আর এই সব ব্যাক্তিদের কর্মকাণ্ডকে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদ সংবিধানের ৪৬ ও ৯৩ (১) অনুচ্ছেদের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারী করে সাংবিধানিক বৈধতা দেন। এই বৈধতা বিগত আওয়ামী সরকার বাতিল করেছে ১৯৯৬ সালের ২১ নং আইন দ্বারা। শেখ মুজিব মামলায় যাদেরকে আসামী করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা ১৫ই আগস্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পুর্বে সেনা বাহিনীর চাকরি ত্যাগ করেছেন কিংবা হারিয়েছেন এবং যারা বেসামরিক ব্যাক্তি তারা ছাড়া অন্য সবাই সাংবিধানিক ভাবে অভিযুক্ত হতে পারেন না। যতদিন পর্যন্ত আমাদের জাতীয় সংবিধানে ১৫০ অনুচ্ছেদের ৪র্থ তফসিলের ৩ (ক) বিধান বিদ্যমান থাকবে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা সাংবিধানিক ভাবে অবৈধ বিবেচিত হবে। জাতীয় সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদের ৪র্থ তফসিলের ৩(ক) বিধান বাতিল করে যদি সবার বিরুদ্ধে শেখ মুজিব মামলায় অভিযোগ আনা হয় তারপরও তা অবৈধ হবে সংবিধানের আইন মোতাবেক। কেননা আমাদের সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৪র্থ তফসিলের ১৮ বিধানে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ৯ ই এপ্রিল ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী ও কার্যাবলীর বৈধতা দেয়া হয়েছে। আর এই বৈধতা বাতিল করতে গেলে অবশ্যই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগবে। অর্থ্যাৎ এই বিধানটি সরাসরি সংবিধান সংশোধনী বিল। ১৯৭৯ সালের ৫ ই এপ্রিল সংবিধান সংশোধনের সময় এই বিধানটি সংবিধানের অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিধানে যা বলা হয়েছে তা সংবিধান সংশোধন ছাড়া বাতিল করা সম্ভব নয়। আমাদের জাতীয় সংবিধানে ১৪২ অনুচ্ছেদে সংবিধানের

www.pathagar.com

বিধান সংশোধন ক্ষমতা সংক্রান্ত আইনের বলে ১৮ বিধানটি পাস হয়েছে। আমাদের সংবিধানে যতদিন ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৪র্থ তফসিলের ১৮ বিধান বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত ১৫ই আগস্ট থেকে ৯ ই এপ্রিল পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না কোন আদালতে। সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বিল নামে যে বিলটি ২৪৩ ভোটে পাশ হয়- তা এখানে তুলে ধরা হলো ঃ চতর্থ তফসিল (১৫০ অনুচ্ছেদ) ফরমানসমাহ, ইত্যাদির অনুমোদন ও সমর্থন ঃ ১৮/১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ ই এপ্রিল তারিখের (উভয় দিন-সহ) মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরুপ কোন ফরমান দ্বারা এই সংবিধানে যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্হাপন ও বিলোপ সাধন করা হইয়াছে তাহা এবং অনুরুপ কোন ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোন আইন হইতে আহরিত বলিয়া বিবেচিত ক্ষমতা বলে অথবা অনুরুপ কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গিয়া বা অনুরুপ বিবেচনায় কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করিবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন ব্যাক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমুহ অথবা প্রণীত, কৃত বা গৃহীত বলিয়া বিবেচিত আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমুহ এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং ওই সকল আদেশ, কাজকর্ম, ব্যাবস্থা বা কার্যধারাসমুহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান ও নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংবিধান সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে ১৫ই আগস্টের বিপ্লবের স্বপক্ষে চুড়ান্ত ফয়সালা করে বিপ্লব ও বিপ্লব সংগঠনকারীদের সাংবিধানিক বৈধতা দান করেছিলেন। সংবিধান সংশোধনী বিল পাসের আগে অর্থ্যাৎ ১৯৭৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল জাতীয় সংসদে শেখ মুজিবের পতনের রাজনৈতিক দিকটা খুব পরিস্কার ও স্বচ্ছ করে ব্যাখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী জনাব শাহ আজিজুর রহমান। সেটা তিনি করেছিলেন স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অনুমোদনক্রমে। **তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব শাহ আজিজুর রহমান বলেছিলেন,"১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে যে কুখ্যাত কালা-কানুন পাস করে বাকশাল নামক একদলীয় স্বৈরাচারী জগদ্দল পাথর দেশের ৮ কোটি মানুষের বুকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল; সেটা ছিল একটা সংসদীয় ক্যু'দাতা (অভ্যুত্থান)। ঐ একদলীয় স্বৈরাচারী অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সংগঠিত হয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান।"**- একই দিন জাতীয় সংসদে মরহুম শেখ মুজিবের উপর একটি শোক প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। তখন স্পীকার ছিলেন জনাব মির্জা গোলাম হাফিজ। কোন মৃত ব্যাক্তির উপর রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করতে গেলে প্রথাগতভাবে তার জীবন বৃত্তান্ত পড়ে শোনানো হয় এবং সংশোধের কার্যবিবরণীতে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবের উপর যে শোক প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত হয় তা উত্থাপন করেন স্বয়ং স্পীকার জনাব মির্জা গোলাম হাফিজ। তাঁর পঠিত শেখ মুজিবের জীবন বৃত্তান্তের শেষ অংশে বলা হয়,**"১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এক রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে তিনি মৃত্যুমখে পতিত**

www.pathagar.com

হন। এটাই মূল কথা। শেখ মুজিবের মৃত্যু কোন মতেই হত্যাকান্ড নয়। শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যু হয়েছিল রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রক্রিয়ায়। (সূত্রঃ সংসদ কার্য বিবরণী, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৭৯ এবং যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি-বই থেকে)।

সংবিধান সংশোধনীর এই ১৮ বিধানে যদি মৌলিক অধিকার লংঘিত হয় তাহলে সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ২৬ অনুচ্ছেদের যে কার্যক্ষমতা আছে তা এখানে অকার্যকর। ২৬ অনুচ্ছেদটি অন্য সকল ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে অকার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ২৬ অনুচ্ছেদের (৩) এ সুস্পস্ট এবং পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। আবার ১৪২ অনুচ্ছেদের (২) এ বলা হয়েছে যে, এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন সংশোধনের ক্ষেত্রে ২৬ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। অতএব, কেউ যদি দাবী করেন যে, সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর ১৫০ অনুচ্ছেদের ৪র্থ তফসিলের ৩(ক) ও ১৮ বিধানে মৌলিক অধিকার লংঘিত হয়েছে। তাহলে অবশ্যই তাঁর সেই দাবী কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার লংঘিত হলে সেখানে ২৬ অনুচ্ছেদ কার্যকর হবে না বলে ২৬ অনুচ্ছেদের (৩) এ বলা হয়েছে। ১৪২ অনুচ্ছেদও ঘোষণা করেছে যে, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ২৬ অনুচ্ছেদ অকার্যকর। কাজেই এ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন তোলা অবান্তর এবং হাস্যকর। ৫ম সংশোধনীর ৩(ক) ও ১৮ বিধানে মৌলিক অধিকার লংঘিত হয়েছে কী হয়নি সে সম্পর্কে কোন আদালতও কোন প্রকার আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও প্রশ্ন তুলতে পারবে না। প্রশ্ন তোলার কোন অধিকার সংবিধান এ ক্ষেত্রে কাউকে দেয়নি। যদি কোন আদালত এ ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন তাহলে তা অবশ্যই অবৈধ, অসাংবিধানিক এবং বাতিল যোগ্য। যদি কোন আদালতের বিচারক এ ধরণের অবৈধ, অসাংবিধানিক কর্মকান্ড বা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সেই বিচারকের বিচার হতে হবে। বিচারক বলে তিনি কোন মতেই আইনের উর্দ্ধে নন। বিচারক হচ্ছেন জাতির বিবেক। সেই বিবেক যদি সংবিধানের বিধান লংঘন করেন তাহলে তাঁর উচিৎ বিচার হতে হবে। আর সেই বিচার করার দায়িত্ব যাদের তাঁরা যদি তা না করেন-তাহলে দেশবাসী তাদের বিচার করবেন।

সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর ১৫০ অনুচ্ছেদের ৪র্থ তফসিলের ৩ (ক) ও ১৮ বিধান সম্পর্কে বিশিষ্ট আইন গবেষক ও আইন বিশারদ জনাব গাজী শামছুর রহমান বলেছেন ঃ 'সামরিক আইন একটি ক্রান্তিকালীন এবং অস্হায়ী ব্যাবস্থা। ক্রান্তিকাল উত্তীর্ণ হইবার পর এই অস্থায়ী ব্যাবস্থা চলিয়া যায়। সেই দিনে কেহ যদি বলিতে চায় যে, সামরিক শাসন আমলে যে সমস্ত বিধান প্রদত্ত হইয়াছে তাহা আইন সম্মত নয়-তবে অবস্থা কি দাঁড়ায় ? সামরিক শাসন আমলে শুধু বিধান করা হয় নাই, বিধানুযায়ী অনেক কাজ করা হইয়াছে ; অনেক পরিবর্তন নিস্পন্ন হইয়াছে ; ইহাদের সবগুলিকেই আইন বহির্ভুত বলিয়া উড়াইয়া দিলে বিষম বিপর্যের সম্মুখীণ হইতে হয়। এই পরিস্হিতি হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য এই সংশোধনীতে বলা হইয়াছে যে, সকল সামরিক আইনের ফরমান বা সামরিক আইন আদেশ বা সামরিক আইন

www.pathagar.com

প্রবিধান বৈধরুপে প্রণীত গন্য হইবে। এই সমস্ত ফরমান, প্রবিধান বা আদেশের বলে রাস্ট্রপতি বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বা অফিসারবর্গ যে সকল আদেশ দিয়াছেন বা কাজ করিয়াছেন তাহা বৈধ গণ্য হইবে। ফরমানের দ্বারা সংবিধানের যে সকল সংশোধন করা হইয়াছে তাহাও বৈধ গণ্য হইবে। সামরিক আইন যে সময় প্রত্যাহার করা হইবে এবং ফরমান বাতিল করা হইবে তখনো সংবিধানের এই সংশোধন-সমূহ কার্যকর ও সক্রিয় থাকিবে। সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হইলে সকল সংশোধনসহ সংবিধান কার্যকর হইবে। " (বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য ঃ পৃঃ১১৩০) এ প্রসংগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন ও সংবিধান গবেষক ড .এরশাদুল বারী বলেছেন, **-পঞ্চম সংশোধনীতে' ৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ও ১৯৭৯ সালের ৯ ই এপ্রিল মধ্যবর্তী সকল প্রক্লেমেশন, প্রক্লেমেশন অর্ডার, মার্শাল ল'রেগুলেশন, মার্শাল ল'অর্ডার ও অন্যান্য ল' কে বৈধতা দেয়া হয়েছে**। (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৩/৮/৯১)

জাতীয় সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিস্ট ৪র্থ তফসিলের ৩ (ক) ও ১৮ বিধান-এ প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক জারীকৃত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকার কারণেই সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েই ইনডেমনিটির কার্য-ক্ষমতা বাতিল ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ জাতীয় সংবিধানের ৪৬ ও ৯৩ অনুচ্ছেদের কার্য-ক্ষমতা বলে যে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারী করেন সেই ইনডেমনিটি বিল (অধ্যাদেশ) বাতিলের সাথে সংবিধান সংশোধনের যে প্রশ্ন জড়িত ছিল বলে জনমনে যে ধারণা হয়েছিল, সেই ধারনার অবসান ঘটেছে। ইনডেমনিটি বিল বাতিলের পর ও শেখ মুজিবর রহমান প্রসংগটি কোন আদালতে উত্থাপন করার অধিকার সাংবিধানিকভাবে কারো নেই। কেননা সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৪র্থ তফসিলের ১৮ বিধানে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ৯ ই এপ্রিল ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সকল ফরমান, আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশের বলে সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্হাপন ও বিলোপ সাধন করা হয়েছে তা বৈধ ভাবে করা হয়েছে বা গ্রহণ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কোন আদালতে তোলা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৪র্থ তফসিলের ১৮ বিধানে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ৭৯ সালের ৯ ই এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সকল ফরমান জারী করা হয়েছে, সেই সকল ফরমান বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ৭৯ সালের ৯ ই এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সকল ফরমান জারী করা হয়েছে, সে সব ফরমানের মধ্যে দু'টি ফরমান জারী করা হয় ১৫ই আগস্ট সংঘটিত ঘঁটনাবলীর উপর ভিত্তি করে। ২০ শে আগস্ট ৭৫, ৮ ই নভেম্বর ৭৫ এ জারীকৃত ফরমানে ১৫ই আগস্ট সংঘটিত ঘঁটনাবলীর বৈধতা দেয়া হয়েছে। আর এই ফরমান দু'টির বৈধতা দেয়া হয়েছে সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের ৩(ক) এবং ১৮ বিধানে। এই ১৮ বিধানটি সরাসরি সংবিধান সংশোধনী বিল। খন্দকার মোশতাক আহমেদের জারীকৃত ইনডেমনিটি বিল আওয়ামী লীগ সরকার বাতিল করতে পারলেও সংবিধান সংশোধনী এই বিলটি বাতিল করতে পারেনি। কাজেই আমাদের সংবিধানে ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৪র্থ তফসিলের ৩(ক) ও ১৮ বিধান বিদ্যমান থাকাকালীন সময়ে কোন আদালতে ১৫ই আগস্ট ৭৫ থেকে ৯ ই এপ্রিল ৭৯ সাল পর্যন্ত জারীকৃত ফরমান সমূহ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। ১৫ই আগস্ট ৭৫ ঘটনাবলীর

www.pathagar.com

বৈধতাকে কেন্দ্র করে জারীকৃত ফরমান সমূহ সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করার কোন সুযোগ সাংবিধানিকভাবে না থাকায় শেখ মুজিব মামলা গ্রহণ করার কোন প্রকার এখতিয়ার ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নেই। সুতারাং মুজিব মামলার রায় ঘোষণার প্রশ্নও আইনতঃ অবান্তর।

শেখ মুজিবের সরকারের পতন ঘটিয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। শেখ মুজিব মারা গেছেন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে। খুশির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে সারা ক্যান্টনমেন্টে। স্বৈরাচারী মুজিববাদী সরকারের পতন ঘটেছে জানতে পেরে সমগ্র জাতি সেদিন স্বঃস্ফূর্তভাবে বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে ঢাকার রাস্তায় লোকের ঢল নেমেছিল। জনগণ সারা দেশজুড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল স্বৈরশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে। মসজিদে মসজিদে জনতা সেদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সদস্যদের জন্য দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেছিলেন। মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল মহল্লায় মহল্লায়। শেখ মুজিব ও তার দোসরদের জন্য সেদিন বাংলাদেশের জনগণ 'ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন' পড়তেও ভূলে গিয়েছিলেন। সবারই এক কথা "দেশ জালিমের হাত থেকে বেঁচে গেছে।" বাংলাদেশের মানুষ জাতির ক্রান্তিলগ্নে অতীতে সব সময় সঠিক রায় দিয়ে এসেছেন-সেটাই তারা আরেকবার প্রমাণ করলেন ১৫ই আগস্টের বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে। স্বৈরাচারী মুজিব সরকার সুপ্রীম কোর্টের সাংবিধানিক ক্ষমতা পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিল। ১৫ই আগস্টের বৈপ্লবিক পরিবর্তন যদি না হত তাহলে গণতন্ত্রের বধ্যভূমিতে আজকের শতাধিক রাজনৈতিক দলকে একদলীয় বাকশালের ধ্বজা বহন করেই বেড়াতে হত। এমনকি আওয়ামী লীগ নামের কোন দলেরও পূনঃজন্ম হত না। গণতান্ত্রিক রাজনীতির পূনঃপ্রতিষ্ঠা করে সুষ্ঠ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটানোই হয়েছ আগস্ট বিপ্লবের মুল লক্ষ। স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের নাগপাশ এবং বিদেশী প্রভূদের যাতাকল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে স্বাধীনতার চেতনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের পথ খুলে দেবার জন্যই সংঘটিত হয়েছিল ১৫ই আগস্টের মহান বিপ্লব। আগস্ট বিপ্লবের সফলতা এবং এর প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন এক উজ্জ্বল-অবিস্মরণীয় মাইলফলক হয়ে চিহ্নিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে। আপোষহীন সংগ্রামী বাংলাদেশীদের জন্য জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিভূ হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে ১৫ই আগস্টের ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ এর বৈপ্লবিক সফল অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনচেতা জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। অম্লান হয়ে থাকবে নিজ মহিমায়। সেদিন আগস্ট বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের মাটি থেকে স্বৈরশাসনের একনায়কত্ব ও এক দলীয় শাসন ব্যাবস্থার পতন ঘটেছিল এবং উম্মোচিত হয়েছিলো বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যাবস্থার দ্বার। আগস্ট বিপ্লব বাকশালী কালো অধ্যায়ের অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিতে গতিশীলতার সৃস্টি করে সূচনা করে এক নতুন দিগন্তের। ১৫ই আগস্ট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনা ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির উন্মেষ ঘটেছিল জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তারই ধারা আজও দূর্বার গতিতে বয়ে চলেছে। নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও জাতীয় মুক্তির প্রতীক ১৫ই আগস্টের সফল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও তার চেতনা সর্বকালের সর্বযুগে এদেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও সচেতন নাগরিকও ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রেরণা যোগাবে নব্য সৃষ্ট মীরজাফর ও জাতীয় বেইমানদের উৎখাত করতে। জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার জ্বলন্ত নিদর্শন ১৫ই

www.pathagar.com

আগস্টের মহান বিপ্লব। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের বিপ্লব দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সমসাময়িক দেশ বিদেশের প্রতিক্রিয়াতেই তা লেখা রয়েছে। ইতিহাসেও তা থাকবে। আজ আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ৩০ বছর আগে স্বাধীনতার যাত্রাকাল থেকে ক্ষমতাসীনরা যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করত, যদি সুষ্ঠ বিচার ব্যাবস্থা থাকত, যদি বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার, বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক কার্যক্রম ও সংঘঠনের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকত, যদি অন্যায়-অত্যাচার, হত্যা-নির্যাতন না হত, যদি সরকার পরিবর্তনের নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যাবস্থা বহাল থাকত তাহলে দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট বিপ্লবের প্রয়োজন হত না। এখন আগস্ট বিপ্লবের ফসল হিসেবে জন্ম লাভকারী বর্তমান গণতান্ত্রিক চারদলীয় ঐক্যজোট (বিএনপি/জামাতসহ অন্যান্য দল) সরকারের নিকট সমস্ত দেশপ্রেমিক জনগনের প্রত্যাশা-৭২ থেকে ৭৫ এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক হত্যা, গুম, রাহাজানী, দুর্নীতি, কালোবাজারী, লুণ্ঠন প্রভৃতি দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ডের জন্য আওয়ামী লীগারদের উপযুক্ত বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান। সেই সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-স্বাভৌমত্বকে অক্ষুন্ন রাখা ও বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করে মানুষের বাক ও ব্যাক্তি স্বাধীনতা সহ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আগস্ট বিপ্লবের মহা নায়কদের যথোপযুক্ত মূল্যায়ন ও জাতীয় বীরের মর্যাদা প্রদান করা উচিত। আর চারদলীয় ঐক্যজোট যদি আগস্ট বিপ্লবের মহা নায়কদের যথোপযুক্ত মূল্যায়ন ও জাতীয় বীরের মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক জনতা কাউকেই ক্ষমা করবে না। এদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ আবার জেগে উঠবে। শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী শাসনের বিরুদ্ধে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর যে দেশবাসী নীরব ভোট বিপ্লব করে চারদলীয় ঐক্যজোটকে ক্ষমতায় বসিয়েছে সেই দেশবাসী আর নিরব থাকবে না। ১লা অক্টোবরের নীরব ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে দেশবাসী আগস্ট বিপ্লবের মহা নায়কদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-স্বাভৌমত্বকে অক্ষুন্ন রাখা ও বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করে মানুষের বাক ও ব্যাক্তি স্বাধীনতা সহ মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার মহা নায়কদের জাতীয় বীরের মর্যাদা দেওয়ার দাবী জানিয়েছে। জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সাহসী জনতার এই দাবী পূরণ না হলে ক্ষমতাসীন বি, এন, পি ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। আরাম-আয়েশ ছেড়ে, সুখের রাজ প্রাসাদ ছেড়ে, বিলাসী জীবন ছেড়ে, পরিবারের পরম আদর-সোহাগ-মায়া ত্যাগ করে, মায়ের আঁচল ছেড়ে, পিতার পরম স্নেহ ছেড়ে, ভাইয়ের ভালবাসা ছেড়ে, বোনের আদর ছেড়ে, প্রিয়তমার সানিধ্য ছেড়ে, নিজেদের জীবনকে মৃত্যুর কাছে বাজী রেখে ১৯৭৫ সালের আগস্টে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে সাহসী সৈনিকেরা মুজিববাদী ফেরাউনের দৃঃশাসন থেকে জনগণকে রক্ষা করেছে, আওয়ামী-বাকশালী-রক্ষীবাহিনীর হাত থেকে মা-বোন-বধূ-ভাবীর ইজ্জত রক্ষা করেছে, জীবন বিনাসকারী হায়েনার হাত থেকে মায়ের সন্তানকে রক্ষা করেছে, নববধূর স্বামীকে উদ্ধার করেছে, নিজ হাতে আপন সন্তানের মাথা কেটে সেই মাথা দিয়ে পিতাকে ফুটবল খেলতে বাধ্য করার নির্মম নিষ্ঠুর পৈশাচিকতার ভয়ংকর পরিবেশ থেকে মুক্তি দিয়েছে, স্বৈরাচারী দানবের হাত থেকে সৎ, সাহসী সাংবাদিকের কলমকে উদ্ধার করেছে, অক্টোপাসের হাত থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা উদ্ধার করেছে-সেই সৈণিক কর্ণেল ফারুক, কর্ণেল শাহরিয়ার, কর্ণেল মহিউদ্দিন এবং সাবেক.এম. পি, জননেতা বজলুল হুদাকে আজ শেখ মুজিব মামলার নামে কেন্দ্রীয় কারাগারের অন্ধকার-আলো-বাতাসহীন-কনডেম সেলের নোংরা স্যাৎ স্যাৎতে বিছানা

www.pathagar.com

বালিশ বিহীন মেঝেতে চিকিৎসাহীন হয়ে না খেতে পেরে কংকালসার দেহ নিয়ে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করছে। জাতীয় মহানায়কদের এরকম অমানবিক পরিবেশের ভিতর ফেলে রেখে দেশ পরিচালনা করা ইসলামী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী আদর্শের সাথে বেইমানী করার শামিল। কারার ঐ লৌহ কপাট ভেংগে গণতন্ত্রের মুক্তিদুতদের মুক্ত করে আনতে ইতিমধ্যে দেশবাসী তাঁদের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মা-বোন-বধূর ইজ্জত রক্ষাকারী দেশপ্রেমিক জাতীয় সাহসী সন্তানদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করে জনতা যে আন্দোলনের সূচনা করতে যাচ্ছে তা অচিরেই জনগণ বিপ্লবে রূপ নেবে। সেই বিপ্লবে ক্ষমতাসীন বি এন পি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ঐতিহাসিক আগস্ট বিপ্লবের মহা নায়কদের যথোপ্রযুক্ত মূল্যায়ন ও জাতীয় বীরের মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হলে অবশ্যই তার ইতিহাস ভিত্তিক করুণ পরিণতি ক্ষমতাসীন বি এন পি কে ভোগ করতেই হবে। ইতিহাসের কালো চাকায় পিষ্ট হতেই হবে। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের জনক, স্বাধীনতার স্থপতি, স্বাধীনতার রূপকার মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানীর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা আর আদর্শের সাথে চরম বিশ্বাস ঘাতকতার নির্মম পরিণতি শেখ মুজিব ও তাঁর দল ভোগ করেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সংঘটিত ঐতিহাসিক বিপ্লবের সিঁড়ি বেঁয়ে এসেছে ৭ নভেম্বরের বিপ্লব। তাই ১৫ই আগস্ট বিপ্লবকে পাশ কাটিয়ে ৭ নভেম্বর পালন করা হবে সত্যের সাথে মিথ্যাচার। ৭ নভেম্বর পালনের আগে অবশ্যই ১৫ই আগস্ট "মহামুক্তির মহান দিবস" পালন করতে হবে। কারণ, ইতিহাস স্বীকৃত সত্য যে, ১৫ই আগস্ট বিপ্লবের পক্ষেই ছিলো ৭ নভেম্বরের সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতি। ১৫ই আগস্ট এবং ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক ঘটনা দুইটি বিচ্ছিন্ন নয়। ১৫ই আগস্ট আর ৭ নভেম্বর একই সুত্রে গাঁথা। একই আদর্শ-লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৫ই আগস্ট, ৭ নভেম্বরের বিপ্লব হয়েছে। একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ সেনা বাহিনীর দেশ প্রেমিক অংশের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল এই দু'টি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান। এই দুইটি ঐতিহাসিক জনপ্রিয় অভ্যুত্থানের চেতনা ছিল জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার চেতনা, গনতন্ত্র ও মানবিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেতনা-ইন্দো-সোভিয়েত বলয়ের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতীয় স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলার চেতনা, স্বৈরশাসন ও একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার চেতনা। ৭ই নভেম্বরের সফল বিপ্লবের পর ঢাকার আকাশ, বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল গগণবিদারী স্লোগানে, স্লোগানে,

- নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ আকবার।
- সিপাই-জনতা ভাই ভাই। খালেদ চক্রের রক্ত চাই।
- খন্দকার মোশতাক জিন্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।
- ফারুক-রশিদ জিন্দাবাদ। খালেদ মোশাররফ মুর্দাবাদ।
- জিয়া-ফারুক-হুদা জিন্দাবাদ। ডালিম-মহিউদ্দিন জিন্দাবাদ।
- জিয়া-ফারুক যেখানে, আমরা আছি সেখানে।

দেশের আপামর জনসাধারণ ৭ই নভেম্বরের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়ে সেনা বাহিনীর বীর জোয়ানদের সাথে যোগ দেয় ঠিক একইভাবে যেভাবে তারা সমর্থন জানিয়েছিল আগস্ট বিপ্লবকে। এই দুই ঐতিহাসিক দিনে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র সংগ্রামী জনতার ঢল নেমেছিল পথে-প্রান্তরে-অলিতে-গলিতে, শহরে-গ্রামে।

www.pathagar.com

নামাজে শুকরানা আদায় করেছিলেন মুসল্লিরা মসজিদে মসজিদে। শহরে-গ্রামে খুশিতে আত্মহারা জনগণের মাঝে মিষ্টি বিতরণের ধুম পড়ে গিয়েছিল। সেনা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ এবং জনগণের একাত্মতায় সৃস্টি হয়েছিল এক দুর্ভেদ্য জাতীয় ঐক্য। সেই দুই ক্রান্তিলগ্নে সম্মিলিতভাবে তারা বাংলাদেশকে পরিণত করেছিল এক দুর্জয় ঘাটিতে। সমগ্র জাতি প্রস্তুত ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যে কোন আগ্রাসন কিংবা হুমকির বিরোধীতা করার জন্য। কাজেই ১৫ই আগস্টকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ৭ নভেম্বর পালন করার কথা যারা বলেন তারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী নয়। তারা জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-স্বাভৌমত্বে বিশ্বাসী নয়। তারা ইসলামী চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক ১৫ই আগস্ট আর ৭ নভেম্বরকে মুখোমুখী দাঁড় করাতে চাচ্ছেন। ১৫ই আগস্ট, ৭ নভেম্বরের বিপ্লব আর সংহতির মধ্যে অনৈক্য, ভেদাভেদ সৃষ্টি করে তারা খুব সহজেই রাবার দিয়ে বাংলাদেশের সীমানা মুছে দিতে চায়। অর্থ্যাৎ এদেশের স্বাধীনতা-স্বাভৌমত্ব অন্য দেশের হাতে তুলে দিতে চায়। এ অবস্থা জনগণ মেনে নেবে না। দেশদ্রোহী ভারতীয় দালালদের খপ্পর থেকে জাতীয়তাবাদকে মুক্ত করতে হবে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা-স্বাভৌমত্বকে রক্ষা করতেই হবে। আওয়ামী-বাকশালী-শেখ মুজিব-হাসিনা চক্রের হাতে নিপীড়িত, নির্যাতিত, মেহনতী দেশপ্রেমিকদের মুখে হাসি ফোটাতে হলে, সন্তাস মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে, মা-বোন-বধুর ইজ্জৎ রক্ষা করতে হলে, কৃষি বিপ্লব করে কৃষকের ভাগ্য গড়তে হলে, নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে হলে, সন্ত্রাস মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ গড়তে হলে, অন্নহীনের মুখে তিন বেলা অন্ন জোটাতে হলে, বস্তহীনকে বস্তের ব্যাবস্থা করে দিতে হলে অবশ্যই ১৫ই আগস্ট বিপ্লব ও ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের নায়কদের একই রকম মূল্যায়ন হতে হবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল দুই রাজনৈতিক শক্তিকে একটি ফোরামে আসতে হবে। দেশবাসী জাতীয়তাবাদের মূল দুই রাজনৈতিক শক্তির ঐক্য চায়। বি এন পি কে এই ঐক্য গড়তে এগিয়ে আসতে হবে দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থে। আগস্ট বিপ্লবের মহানায়কদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সাংবিধানিকভাবে অবৈধ শেখ মুজিব মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল ফারুক রহমান, কর্ণেল শাহরিয়ার রশিদ, কর্ণেল মহিউদ্দিন আহমেদ এবং সাবেক এম. পি, জননেতা বজলুল হদাকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদানের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির ঐক্য সম্ভব। ১৫ই আগস্ট আর ৭ নভেম্বরের বিপ্লবের নায়করা ঐক্যবদ্ধ হলে যারা এদেশে জন্ম নিয়ে, এদেশের আলো-বাতাসে বড় হয়ে, এদেশের জনগণের সাথে বেইমানী করে আসছে-তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বা পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে। 'র' আগ্রাসী থাবা যে শিকড় গেড়ে বসেছে এদেশের রাজনীতিতে তা জাতীয়তাবাদী নেতা ও জনতার ঐক্যের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বাংলাদেশের সীমানা রাবার দিয়ে মুছে ফেলার কথা আর কেউ বলবে না। একটি লাশ পড়লে দশটি লাশ ফেলার নিদের্শ কোন দলীয় নেত্রী দেবার দূঃসাহস দেখাবে না। কোন দলের ছাত্র নেতা ধর্ষণের শততম উৎসব করে আইনের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। জয়নাল হাজারীর মত মুকুটহীন সন্ত্রাসী সম্রাটের পক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে জনসভায় কোন প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবে না। প্রকাশ্য দিবালোকে ইটভাটির জ্বলন্ত আগুনে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে কেউ উল্লাস করার দূঃসাহস দেখাতে পারবে না। দলীয় নেতা-কর্মীদের দিয়ে হিন্দু সম্পদায়ের মূর্তি

www.pathagar.com

ভেংগে, গভীর রাতে মেয়ে ধর্ষণ করে হিন্দু-মুসলিম দাংগা বাঁধানের চেষ্টা কেউ করতে পারবে না।

লেখক পরিচিতি ঃ স্যান্টন রহমান, সেক্রটারী জেনারেল, জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক ফোরাম, ঢাকা।

ইনডেমনিটি কেন অপরিহার্য ছিল ?

→ সাবেক প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বিপ্লব পরবর্তী সরকারের প্রধান খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ১৮ ই আগস্ট ৯১ তারিখে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, -যে কোন সফল সামরিক অভ্যুথানই একটি বৈধ সরকারের ভিত্তি হতে পারে। ১৫ই আগস্ট সফল সামরিক অভ্যুথানের পর দেশে যে ক্ষমতা কাঠামো ও পরিবেশ ছিলো তাতে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যাস জারি ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিলো না। সে সময় মন্ত্রিসভার অন্যান্য আওয়ামী লীগ সদস্য বা অন্য কেউ-ই এই ইনডেমনিটি অর্ডিন্যাস জারির বিরোধীতা করেননি। ১৯৭৫ সালের সামরিক শাসনের পর গঠিত সরকারের সদস্য ছিলেন তিনি এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারাও। ১৯৪৯ সালের ভারতীয় সংবিধানের ৩৪ নং অসুচ্ছেদ, ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের ১৯৬ নং অনুচ্ছেদ, ১৯৬২ সালে সংবিধানের ২২৩ অনুচ্ছেদে সামরিক প্রশাসনের সংগে সম্পর্কিত কার্যাবলীকে ইডেমনিটি দেয়ার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ৪৬ নং অনুচ্ছেদে ইনডেমনিটি সংক্রান্ত ঘোষণায় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের যে কোন এলাকার শান্তি ও শৃংখলা পুনরুদ্ধার ও রক্ষার সংগে সম্পর্কিত কাজে জড়িত ব্যাক্তিদের এবং এর-জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন শান্তি আদেশ ও অন্যান্য কার্যাবলীকে ইনডেমনিটি দেয়ার বিধান রয়েছে। ১৯৭৫ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর খন্দকার মোস্তাক আহমেদ এই পরিবর্তনের সংগে সম্পর্কিত সমস্ত কার্যাবলীকে বৈধ করার জন্য বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি করেন। ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে একটি নতুন বিষয় ছিলো সংবিধান বলবত রাখার সিদ্ধান্ত। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে সামরিক আইন জারির সময় সংবিধান বাতিল করা হয়ে -ছিলো। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সফল সামরিক অভ্যুথানের পর সংবিধান বাতিল বা স্হগিত কিছুই করা হয়নি। এভাবেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সফল সামরিক অভ্যুথান হয়ে পড়ে খন্দকার মোস্তাক আহমেদ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকারের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপটের পরোক্ষ দায় ততকালীন সামরিক, বেসামরিক ও রাজনৈতিক শীর্ষ ব্যাক্তিদের। ১৫ই আগস্ট-পরবর্তী কর্মকাণ্ডে এ-রা মুজিবের অপসারণকে সমর্থন করেছেন কথায় কিংবা কাজে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। সেখানে মুজিবের হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি সুস্পস্টভাবে সমর্থন বা অসমর্থনের দায়টি অনুচ্চারিত রাখা হয়েছিলো। অথচ মুজিব অপসারন্যের ক্ষেত্রে হত্যাকান্ড এড়ানো যেত-কি-না তা নিয়ে সে সময় কেউ কোন প্রশ্ন তোলেননি। শেখ মুজিব চতূর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তার নিকট রাস্ট্রক্ষমতা সর্বতোভাবে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। বাকশাল গঠনের মাধ্যমে কেবল মাত্র তার মনোনীত ব্যাক্তিদের সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অবস্হা সৃস্টি করেছিলেন। অন্য দিকে তিনি রাস্ট্রপতি পদে তার অবস্হান সুনিশ্চিত রাখার জন্য রাস্ট্রপতির অপসারনের আইনানুগ পথ অবলম্বন ও দু:সাধ্য

www.pathagar.com

করে তুলেছিলেন। শেখ মুজিব কেবল মাত্র তার দলের ও তারই অনুগত ব্যাক্তিদের সংসদ নির্বাচিত হওয়ার ব্যাবস্হা করেন এবং তাদের কমপক্ষে তিন-চতর্থাংশের বিরোধীতার ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট অপসারনের নতুন নিয়ম করে কার্যত: প্রেসিডেন্ট পদ থেকে তার আইনানুগ অপসারণকে দু:সাধ্য করে তোলেন। এ নিয়ম জারির ৭ মাসের মধ্যে তিনি অপসারিত হন। তা মেনে নেয় ততকালীন রাজনৈতিক ও সামরিক বে-সামরিক কর্তৃপক্ষ। সামরিক বাহিনীর পদস্হ অফিসাররা বিরোধীতা বা বিচার কোনটিই করেননি। পদস্হ সামরিক কর্মকর্তারা নতুন সরকারের পদবিন্যাসে সম্পর্কিত হন এবং সরকারকে সমর্থন দেন। নতুন সরকারের প্রধান খন্দকার মোস্তাক যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাতে শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই অন্তরভূক্ত হন। যারা মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে-ছিলেন তারা খন্দকার মোশতাক আহমেদের সংগে আলাপ-আলোচনার পর তা করেছিলেন । সাবেক প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ সাপ্তাহিক বিচিত্রাকে বলেছেন, -১৫ই আগস্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থানের নায়করা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, আমরা সরকার গঠন করেছিলাম। (সৌজন্যে : সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ২৩/৮/৯১)

ইনডেমনিটি {দায় মুক্তি} বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনের কতিপয় বিধান

(১) ইনডেমনিটি প্রদান অর্থাৎ দায় মুক্তি বিধানের ক্ষমতা বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৬ ঃ- এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যাক্তি বা অন্য কোন ব্যাক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অনচলে শৃংখলা রক্ষা বা পূণর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যাক্তিকে দায় মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অনচলে প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশ, দন্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।

(২) আওয়ামী লীগ ও মুক্তি বাহিনীকে প্রদত্ত ইডেমনিটি (দায় মুক্তি) ঃ ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী-বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫০ ঃ- এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্বেও চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

চতুর্থ তফসিল (১৫০ অনুচ্ছেদ)

ধারাবাহিকতা রক্ষা ও অন্তবর্তী ব্যবস্থাবলী ঃ- ৩। (১) ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে এই সংবিধান প্রবর্তনের তারিখের মধ্যে প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত সকল আইন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বা যে কোন আইন হইতে আহরিত বা আহরিত বলিয়া বিবেচিত কর্তৃত্বের অধীন অনুরুপ মেয়াদের মধ্যে প্রযুক্ত সকল ক্ষমতা বা কৃত সকল কার্য এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং তাহা আইনানুযায়ী যথার্থভাবে প্রণীত, প্রযুক্ত ও কৃত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।

৩ (৩) এই সংবিধানের যে কোন বিধান সংসদের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে সংসদ প্রথমবার মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধান রাষ্ট্রপতিকে আদেশের দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত কোন আদেশ এইরূপে সক্রিয় হইবে, যেন তাহার বিধানাবলী সংসদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

(৩) ১৯৭১ সালে মুক্তি বাহিনীর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী রাজাকার বাহিনী, আলবদর বাহিনী আলসামস্ বাহিনীসহ সকল বাহিনী ও রাজনৈতিক শক্তিকে প্রদত্ত ইডেমনিটি (দায় মুক্তি) ঃ (সরকারী ঘোষণা ঃ ১৬মে, ১৯৭৩) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তি বাহিনীর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী সকলের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ, মামলা ও তদন্ত প্রত্যাহার ও প্রদত্ত দন্ডাদেশ মওকুফ করে দেন।

(৪) খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ও জেনারেল জিয়াউর রহমানের সরকারকে প্রদত্ত ইডেমনিটি (দায় মুক্তি) ঃ-

চতর্থ তফসিল (১৫০ অনুচ্ছেদ) ফরমানসমূহ, ইত্যাদির অনুমোদন ও সমর্থন ঃ

১৮/১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ ই এপ্রিল তারিখের (উভয় দিন-সহ) মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোন ফরমান দ্বারা এই সংবিধানে যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপ সাধন করা হইয়াছে তাহা এবং অনুরূপ কোন ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোন আইন হইতে আহরিত বলিয়া বিবেচিত ক্ষমতা বলে অথবা অনুরূপ কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গিয়া বা অনুরূপ বিবেচনায় কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করিবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন ব্যাক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ অথবা প্রণীত, কৃত বা গৃহীত বলিয়া বিবেচিত আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং ঐসকল আদেশ, কাজকর্ম, ব্যাবস্থা বা কার্যধারাসমুহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) জেনারেল এরশাদের সরকারকে প্রদত্ত ইডেমনিটি (দায় মুক্তি) ঃ চতুর্থ তফসিল (১৫০ অনুচ্ছেদ) ঃ

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের ফরমান,ইত্যাদির অনুমোদন ও সমর্থন ঃ

১৯। (১) ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের ফরমান, অতঃপর যাহা এই অনুচ্ছেদে উক্ত ফরমান বলিয়া উল্লেখিত এবং ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ ও সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের ১ নং আইন) প্রবর্তনের তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে, অতঃপর যাহা এই অনুচ্ছেদে উক্ত মেয়াদ বলিয়া উল্লিখিত, প্রণীত অন্যান্য সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ, সামরিক আইন নির্দেশ, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য আইন এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং বৈধভাবে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারনেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

www.pathagar.com

(৬) বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে প্রদত্ত ইনডেমনিটি (দায় মুক্তি) ঃ চতর্থ তফসিল (১৫০ অনুচ্ছেদ)

উপ-রাষ্ট্রপতির নিয়োগ অনুমোদন ও সমর্থন ইত্যাদি

২১ (১) ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ ও শপথ প্রদান এবং তাহার নিকট পদত্যাগ প্রদান এবং ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (আইন নং ২৪, ১৯৯১)-এর প্রবর্তনের তারিখের (উভয় দিনের) মধ্যে বা ২১ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে (যাহাই পরে হউক) উক্ত-উপ-রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রণীত সকল আইন ও অধ্যাদেশ এবং প্রদত্ত, কৃত ও গ্রহীত অথবা প্রদত্ত, কৃত ও গ্রহীত বলিয়া বিবেচিত সকল আদেশ, সকল কাজকর্ম এবং সকল ব্যাবস্থা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং আইনানুযায়ী যর্থার্থভাবে প্রণীত, প্রদত্ত, কৃতও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল।

২১। (২) সংবিধান (একাদশ সংশোধন) আইন ১৯৯১ (আইন নং ২৪, ১৯৯১) প্রবর্তনের পর এবং সংবিধান মোতাবেক নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া কার্যভার গ্রহনের পর উক্ত উপ-রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর হইতে তাহার উক্ত কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহনের তারিখের মধ্যবর্তী সময় এর (ঝবপঃরড়হ ২(ধ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে প্রকৃত কর্ম
(ধপঃঁধষ ংবৎারপব) বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে প্রদত্ত ইডেমনিটি (দায় মুক্তি) ঃ

জাতীয় রক্ষীবাহিনী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ (অধ্যাদেশ নং ২১, ১৯৭৩) অনুচ্ছেদ ১৬ ক

১৬। ক। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা তাদের যে কোন কাজ এই আইনের অধীনে অথবা এই আইনে প্রণীত কোন বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে করেছেন বলে গণ্য হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের, অভিযোগ পেশ কিংবা আইগত কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাইবে না।

জনগণের বিপ্লব ছাড়া সহজে, স্বাচ্ছন্দে কোন পরিবর্তন আনার কোন আশাই ছিল না

——————→ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

গত ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দুরাবস্থা সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন...

——————→ সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান

আমরা কথাবার্তায় জনগণকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখালাম। কিন্তু স্বাধীনতা পেতে হলে যে যুদ্ধ করতে হবে তার কোনই আয়োজন করা হয়নি। ফলে প্রথমের দিকে বিভ্রাট্রের সৃষ্টি হলেও পরে

www.pathagar.com

আমরা মনের দিক দিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিলাম। দেশের সমস্ত জনগণ বড় ছোট সকলেই বিভিন্নভাবে কেউ যুদ্ধের ময়দানে, কেউ অন্য জায়গায় থেকে এই স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে গিয়েছিলাম। এবং তার ফলে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকেই আমাদের স্বাধীনতা, স্বাভৌমত্ব ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা চলছিল। তার জন্যেও আমাদের মধ্যে থেকে কতিপয় ব্যাক্তি দায়ী ছিলেন। আমরা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিকভাবে, আন্তর্জাতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে নিজেদেরকে বিক্রি করে দিচ্ছছিলাম। আমাদের জাতীয় জীবনে নেমে আসে এক ভয়াবহ অন্ধকার। স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে জাতির কত আশা ছিল, কত স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু অল্প ক'দিনের মধ্যেই আমাদের সকল স্বপ্ন, সকল আশা যেন এক রাহুগ্রাসে পতিত হয়। ধীরে ধীরে আমরা এসে দাঁড়ায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। আমাদের ক্ষুধার অন্ন ছিল না, পরনের কাপড় ছিল না, এমনকি জীবনের নিরাপত্তা পর্যন্ত ছিল না। দুনিয়ার কাছে আমরা ছিলাম বিদ্রুপ ও করুণার পাত্র। কিন্তু জনগণের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই অবস্থায় একটা দেশ বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু কোন জাতির কখন বিনাশ নেই। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর ভর করে জাতি আবার ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরে এসেছে। এটা সহজে হয়নি। সহজে এটা হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ১৯৭৫ সালের মাঝের দিকে এমন একটি পরিস্থিতি গড়ে উঠলো দেশে যার ফলে একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। সেই সময়ের পরেও বাইরে থেকে আমাদের প্রতি বিভিন্নভাবে হামলা চলতে থাকলো। কিন্তু জনগণ এক ছিলেন, ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। আমরা রুখতে পেরেছিলাম বিদেশী আগ্রাসন। আমরা হৈ-হুল্লোড় করিনি। চিল্লা-চিল্লি করিনি। শৃংখলার মাধ্যমে আমরা আমাদেরকে তৈরী করেছি বিদেশী হামলা মোকাবেলা করার জন্য।

(জিয়াউর রহমানের নির্বাচিত ভাষণ থেকে)

গত ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দুরাবস্থা সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন...

——————▶ সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান

আমাদের প্রিয় দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসী সজাগ থাকবেন বলে আমি আশা করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিক রাষ্ট্র বিরোধীদের এই হীন ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবেন। আমার সামরিক বাহিনীর সহকমীবৃন্দ ও আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা আপনাদের কল্যাণ এবং স্বার্থ রক্ষা করে একটি আধুনিক এবং দক্ষ বাহিনী হিসাবে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে গড়ে তোলা। গত ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দুরাবস্থা সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন... স্বাধীনতার পর ঐদিন পর্যন্ত যে কাজ করে চলেছি। অবশেষে, আমি সর্বস্তরের জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীর বীর সেনানীদের অনুরোধ জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন কোন স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হন। জাতির এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দেশপ্রেমিক জনগণকে রাষ্ট্র বিরোধী যে কোন মহলের চাপের শিকার না হওয়ার জন্য উদ্দাত্ত আহবান জানাচ্ছি। (১১ই নভেম্বর ১৯৭৫, রেডিও, টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভাষণ থেকে)

www.pathagar.com

আগস্ট পট পরিবর্তন জিয়াকে শীর্ষ সামরিক নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে

@ ১৯৭৫ সালের আগস্ট পট পরিবর্তনের ফলে তদানীন্তন সেনা বাহিনীর ডেপুটি চীফ জেনারেল জিয়া সেনা প্রধান হলেন। সময়ের প্রয়োজন আবার তাঁকে ইতিহাসের মুখোমুখী এনে দাঁড় করিয়েছিল। ইতিহাস আবার জিয়াউর রহমানের কাছেই জাতীয় দায়িত্ব গচ্ছিত রেখে নিশ্চিত হল। আগস্ট পট পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ৩রা নভেম্বর সংঘটিত প্রতি বিপ্লবের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জিয়ার নেতৃত্ব আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। সোভিয়েত-ভারত অক্ষ শক্তির প্রশ্রয়ে আর একটি পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে সেদিন খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে। বিলুপ্ত ঘোষিত বিবরে লুকানো বাকশালের অনুসারীরা খালেদ মোশাররফের মাকে সামনে রেখে ঢাকায় অভ্যুত্থানের পক্ষে মিছিল নামায়। সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানকে করা হয় সপরিবারে গৃহবন্দী। প্রেসিডেন্ট মোশতাক যিনি আগস্ট পট পরিবর্তনের ধারায় সশস্ত্র বাহিনীর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ও তাদের সমর্থনে প্রেসিডেন্টের ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করা হলো। মুহুর্তে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো দেশের সবকটি সেনা শিবিরে। সাধারণ সৈনিকরা জাতীয় সংকট মুহূর্তে তাদের করণীয় স্থির করেছিলো। স্বঘোষিত সেনা প্রধান খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুললো। ঢাকাসহ আশপাশের সেনা ছাউনীগুলো থেকে সৈনিকরা তাদের প্রিয় নেতা মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক জিয়াকে মুক্ত করে আনার জন্য তার ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো। যশোর-বগুড়া-রংপুরসহ সারাদেশ থেকে সেনা বাহিনীর জওয়ানরা ঢাকা ছুটে এলো বিদ্যুৎ গতিতে। সাধারণ সৈনিক-জনতা সেদিন সিপাহী বিপ্লবের আর এক ইতিহাস রচনা করলো। প্রতি অভ্যুত্থান ব্যার্থ হলো। প্রতি বিপ্লবের নেতা খালেদ মোশাররফ পরাজিত-নিহত হলেন ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিকতায়। ১৯৭৫ সালের আগস্ট পট পরিবর্তন জিয়াকে শীর্ষ সামরিক নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। (দেশ নায়ক শহীদ জিয়াঃপৃঃ১০৪)

৭৫ এর ১৫ই আগস্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থানের পর দেশবাসী বলেছিল 'নাজাত পেয়েছি'।

——————► মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশকে ভারতের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করলে দেশবাসী এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠে। গণরোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেদিনের শাসক আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হত্যা করে দেশে একদল ও এক ব্যাক্তির বাকশাল শাসন কায়েম করে। মাওলানা ভাসানী দিল্লীর গোলামী এবং একদলীয় বাকশাল শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানান। ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাকশাল স্বৈরশাসনের

www.pathagar.com

পতন হয়। ১৫ই আগস্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থানের পর মানুষ চোখের পানি ফেলেনি। দেশবাসী সেদিন বলেছিল 'নাজাত পেয়েছি'। আল্লাহ কাউকে সীমা অতিক্রম করতে দেন না। (সুত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক ৩০শেজুলাই ১৯৯৮ ও দৈনিক ইনকিলাব ১৭-১১-২০০০)

১৫ই আগস্টের সফল সামরিক অভ্যুত্থানে দেশ ও জাতি মুক্তি পেয়েছিল দাসত্বের নাগপাশ থেকে

——→ আইন মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ

২৩/১/১৯৯২ তারিখে জাতীয় সংসদের অধিবেশনে '৭২ থেকে '৭৫ সালের আওয়ামী-বাকশালী দুঃশাসন প্রসংগে (বর্তমান চারদলীয় ঐক্যজোট সরকারের মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী) জনাব ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, "১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা জারি করার পর ২৯শে ডিসেম্বর ভোরে আমাকে বিনা অপরাধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে বন্দী করা হয়েছিল। অথচ সরকার আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারেনি সেদিন। এই তোফায়েল সাহেবই রক্ষীবাহিনীর ইনচার্জ ছিলেন। আর এই বাহিনীর হাতেই এ দেশের ৪০ হাজার নিরীহ মানুষ জীবন হারিয়েছেন। সিরাজ সিকদারের হত্যার কথা আজও দেশবাসী ভুলে যায়নি। '৭২ থেকে ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট অব্দি আওয়ামী-বাকশালী শাসনকাল এ দেশের ইতিহাসে সব চাইতে কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। জাতীয় বেইমান ও বিশ্বাসঘাতকরা যখন জাতির কাঁধে একনায়কতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রের বোঝা চাপিয়ে দেয়, জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়, ব্যাক্তি ও গোষ্টি স্বার্থ হাসিলের জন্য মীরজাফরের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তাদের অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য তাদের দুঃশাসন উৎখাত করার জন্য দেশপ্রেমিকদের বিপ্লবের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে যুগে যুগে। একই যুক্তিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বিপ্লব সংগঠিত করেছিল বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর দেশ প্রেমিক অংশ। সেই বিপ্লব ছিল একটি সফল অভ্যুত্থান। দেশ ও জাতি মুক্তি পেয়েছিল দাসত্বের নাগপাশ ও স্বৈরশাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে। ১৫ই আগস্টের বিপ্লব স্বতঃস্ফুর্ত জনসমর্থন পেয়ে একটি জনপ্রিয় অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। বাকশাল সরকারের উৎখাত ও মোশতাক সরকারের প্রতি জনগণের স্বতঃস্ফুত সমর্থন একথায় প্রমান করেছিল জনগণের আশা-আকাংখার সাথে বাকশালের কোন সম্পর্ক ছিল না। (সুত্রঃ সংসদ কার্য বিবরণী ১৯৯২ ও যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি নামের বই থেকে)

গণতন্ত্র চাইলে একদলীয় শাসন অবসানকারীদের ফাঁসি চাওয়া যায় না।

——→ নৌ পরিবহন মন্ত্রী কর্ণেল আকবর হোসেন

১৯৯১ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় সংসদে কর্ণেল (অবঃ) আনোয়ার হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, গণতন্ত্রের পথকে রুদ্ধ করা হলেই সন্ত্রাস জন্ম নেয়। রুমানিয়ার চসেস্কু দম্পতির ন্যায়,

www.pathagar.com

হত্যা ব্যতীত একদলীয় শাসনের অবসান এবং ক্ষমতার পরিবর্তন সম্ভব নয়। সংসদের পবিত্র অংগনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল বিএনপি'র এমপি জনাব কর্ণেল (অবঃ) আকবর হোসেন যর্থাথ কথায় বলেছেন, কেননা স্বৈরাচারী শেখ মুজিব এতই জঘন্যভাবে ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে ধরেছিলেন যে, তাকে অপসারনের জন্য সাংবিধানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার সামান্যতম অবকাশও তিনি অবশিষ্ট রাখেননি। সংবিধানে চতর্থ সংশোধনী এনে মুজিব রাতারাতি দেশের দন্ডমুণ্ডের কর্তা বনে যান। মৌলিক বাক স্বাধীনতা হরণ করে গঠন করলেন বাকশাল। সমস্ত দল এবং পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। সংবিধানে ৩৪ ধারার মাধ্যমে শেখ মুজিব অগণতান্ত্রিক পন্থায় বিনা নির্বাচনে প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হন এবং নিজেকে অঘোষিত আজীবন প্রেসিডেন্ট হিসাবে উপস্থাপন করেন। মুজিবী দৃঃশাসনে জাতি অতিষ্ঠ হয়ে সাংবিধানিক পথ রুদ্ধ থাকায় দেশ প্রেমিক সেনাবাহিনী জনগনের পাশে দাঁড়ায়। ১৫ই আগস্টের সুবহে সাদিকে সংঘটিত হল প্রত্যাশিত আগস্ট বিপ্লব। জাতির ইতিহাসে ১৫ই আগস্ট মহামুক্তির মহান দিবস হিসাবে আখ্যায়িত হল। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার তাগিদেই দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ৫ম সংশোধনী পাস করে। ৫ম সংশোধনীতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আকিদা বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়ে সংবিধান থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতা আর তথাকথিত সমাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানই জাতীয় আশা-আকাংখ্যার প্রতীভূ বিবেচিত হয়। সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। পনচম সংশোধনীর মাধ্যমে তাওহিদী জনতা মুক্তির স্বাদ পায়। দীর্ঘদিনেরর লালিত স্বপ্ন ঈমান-আকিদা নিয়ে বেঁচে থাকার গ্যারাণ্টি দিয়েছে পনচম সংশোধনী। বিসমিল্লাহির রাহিম দিয়ে শুরু হয়েছে সংবিধানের কার্যক্রম। এসবই ছিল ১৫ই আগস্টে সংঘটিত বিপ্লবের ফসল। সবকিছু হারিয়ে জাতি যখন হতাশার তিমিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য উচ্ছকিত হওয়ায় জনগণ আশার আলো দেখতে পেয়েছে। আগস্ট বিপ্লব তাই জাতির মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত। ১৫ই আগস্টে জাতি যে সঠিক দিক-নিদের্শণা পেয়েছিল-যার ফসল সংবিধানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যই সমস্ত কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে। ৫ম সংশোধনী মূলতঃ আগস্ট বিপ্লবের মুল্যবোধকেই উচ্চকিত করেছে। এতে করে জনগণের আশা-আকাংক্ষা আর লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছে। (২৪শে অক্টোবর, ১৯৯১ সালে প্রকাশিত দৈনিক মিল্লাত থেকে।) গণতন্ত্র চাইলে একদলীয় শাসন অবসানকারীদের ফাঁসি চাওয়া যায় না। নৌ পরিবহন মন্ত্রী কর্ণেল আকবর হোসেন

(ভোরের কাগজ, ২২/০১/১৯৯৭)

শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করে ৭৫-এর ২৫শে জানুয়ারীতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ১৫ই আগস্ট কেবল তার লাশ দাফন করা হয়।

——————► যুব, ক্রীড়ামন্ত্রী ও মেয়র সাদেক হোসেন খোকা

মুজিব সারা জীবন গণতন্ত্রের কথা বলে রাজনীতি করার পর ক্ষমতায় গিয়ে যে দিন সেই গণতন্ত্রকে হত্যা করে নিজেকে ও তার পরিবারকে মসনদে চিরস্থায়ী করার লক্ষে সংসদীয় অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বাকশাল কায়েম করেন, সে দিনই তার রাজনৈতিক মৃত্যু হয়ে যায়। বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্র হত্যা করে শেখ মুজিব স্বয়ং তাঁর ছবি ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছেন। গণতন্ত্রকে

www.pathagar.com

হত্যা করে শেখ মুজিব এদেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাকশাল গঠন করেছিলেন। একদলীয় বাকশাল গঠনের জন্য ৩০ হাজার দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যার মাধ্যমে একটি প্রজন্ম ধ্বংসের জন্য এদেশের লাখ লাখ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে রক্ত দেয়নি। শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করে '৭৫-এর ২৫শে জানুয়ারীতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ১৫ই আগস্ট কেবল তার লাশ দাফন করা হয়। ১৯৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত সময় কালে তার জুলুম-অত্যাচার-হত্যা-নির্যাতন ও দুস্কর্মের জন্য শ্রীঘ্রই এদেশে তার মরণোত্তর বিচার হবে।

(সুত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৬-০১-২০০১)

১৫ই আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পরিনতি

——————→ সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর

১৫ই আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পরিনতি। আর এই পরিনতির জন্য স্বয়ং মুজিবের ক্ষমতা লিপ্সাই দায়ী। তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে কমরেড সিরাজ সিকদার, কাজী নাসের, আফতাফ মোল্লা, নেবাল সিরাজ প্রমুখ প্রগতিশীল কর্মীসহ হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে ক্ষমতাসীন গোষ্টির ইংগিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। গোটা দেশবাসী এ ফ্যাসিবাদী এক নায়কতন্ত্রের অবসান কামনা করেছিল। একজন গণতন্ত্রী হিসাবে আমারও প্রত্যাশা তাই ছিল। (সাপ্তাহিক জনকথা, ১৫-০৮-৮১)

বাংলাদেশের জনগণের কাছে ১৫ই আগস্ট হচ্ছে একটি "নাজাত দিবস"।

——————→ সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান ও হাজী দানেশসহ ১০ নেতা

◎ আওয়ামী লীগ ১৯৭৭ সালের ১৫ই আগস্টকে "শোক দিবস" হিসাবে পালনের ডাক দেয়। সে প্রেক্ষিতে ১৪ই আগস্ট আতাউর রহমান খান ও হাজী দানেশসহ ১০ নেতা সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে এই প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে বলেনঃ "আমরা অতীব ক্ষোভের সাথে লক্ষ করছি যে, আওয়ামী লীগ দেশের রাজনীতি ঘোলাটে ও শান্তি-শৃংখলা বিনস্ট করার উদ্দেশ্যে এই বছর ১৫ই আগস্টকে শোক দিবস হিসাবে পালনের কথা ঘোষণা করেছে। আমরা মনে করি, জাতি ও জনগণের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের এই তথাকথিত শোক দিবস আর একটি নতুন রাজনৈতিক চক্রান্ত। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও বিরোধীতা করছি। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মুজিব সরকারের পতনের মাধ্যমে বাংলাদেশের আট কোটি মানুষ ভারত-রাশিয়ার নাগপাশ ও আওয়ামী লীগের দুঃশাসন, অবর্ণনীয় দূর্নীতি, লুটপাট, জেল-জুলুম, হত্যাকাণ্ড থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। মুজিব আমলে মানুষ সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মহামারীর ফলে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও হাজার হাজার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মী ও নেতার নির্মম

www.pathagar.com

হত্যার কথা এদেশের জনগণ কোন দিনই ভুলতে পারবে না। তাই বাংলাদেশের জনগণের কাছে ১৫ই আগস্ট হচ্ছে একটি "নাজাত দিবস"। (সুত্রঃ কথামালার রাজনীতি-১৯৭২-৭৯, পৃষ্টা-৭২)

জাতির পিতা মরলে কান্দে না হাসে ? তখন দেশবাসী উৎসব করেছে।

——————▶ ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম

২৭ শে জানুয়ারি ২০০২ দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে বংগবন্ধু সম্পর্কে মুল্যায়ন, জাতির পিতা, তার হত্যাকারীদের সাধারন ক্ষমা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের শরীক দল জামাতে ইসলামীর সাবেক আমীর ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন ঃ তিনি খুবই বড় মনের ছিলেন। আমি তাকে ক্ষুদ্র মনা মনে করি না। তবে তার রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে দুরদর্শিতার অভাব ছিলো। পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি আমার চেয়ে বড় নেতা ছিলেন। তার সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব না থাকলেও রাজনৈতিক বন্ধুত্ব ছিল। তাকে আমি জাতির পিতা বলি না। বাংগালী জাতির কি ৭১ সালে জন্ম হয়েছে ? এর আগে বাংগালী ছিল না ? ৭৫ সালে তিনি যখন স্বপরিবারে নিহত হলেন, তখন কি পিতা হত্যার কারণে যে শোক করার কথা জাতি তা করেছে ? ... ভয় ? সাধারন জনগণ ভয় করে না। আমি তখন ছিলাম লণ্ডনে। টাইম পত্রিকা তখন লিখেছিল 'দিনটি শুক্রবার ছিল। জুমার নামাজের জন্য কারফিউ দ'ঘণ্টা তুলে দেয়া হয়। বিরাট সংখ্যক মানুষ আনন্দমুখর ভংগিতে রাজপথে চলছিল, যেন তারা কোন জাতীয় উৎসব পালন করতে যাচ্ছে। ঐ সময় যারা ঢাকায় ছিলেন তারাই সাক্ষী দিতে পারেন যে, লণ্ডনের পত্রিকা সঠিক রিপোর্ট দিয়েছে কিনা। ব্যক্তিগত স্বার্থে যদি তারা হত্যা করে সেই হিসেবে যদি হত্যাকাণ্ডকে গণ্য করা হয়, তবে অন্য কথা। আর যদি এটা সামরিক ক্যু হয়, সামরিক ক্যুতে কেউ যদি জিতে যায়, তাহলে তো দোষী বলে সাবস্ত হয় না। এটা কি সামরিক ক্যু ছিল, না ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ড ছিল তার উপর নির্ভর করবে ক্ষমা পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি। আমি এ হত্যাকে ব্যক্তিগত স্বার্থে হত্যা বলে মনে করি না। তখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তনের কোন রাস্তা রাখা হয়নি। এক ব্যক্তির হাতে সব। 'এক নেতা একদেশ, শেখ মুজিবের বাংলাদেশ'। তিনি বাকশাল গঠন করে সে ব্যবস্থা করলেন। সেখানে তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তনের কোন সুযোগ ছিল না। যারা পরিবর্তন করেছিল তারা এই পথ গ্রহন করে। তা সামরিক মহল থেকে এসেছে। খোন্দকার মোশতাক যে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে, সেখানে শেখ মুজিবের লোকও ছিল। পার্লামেণ্ট ভাংগেনি মোশতাক। পার্লামেণ্ট ভাংলেন মুজিবের পক্ষের লোক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ।

- ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগ সরকার যে একদলীয় চরম স্বৈরশাসন কায়েম করেছিল তা থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করার জন্য একটি সফল সামরিক অভ্যুত্থান ব্যতীত কোন উপায় ছিল না। ১৫ই আগস্টের ঐ সামরিক বিপ্লব না হলে হয়তো আজও দেশ ঐ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেত না। (সুত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৭-৯-২০০২)
- মংগলবার। ৩০শে মাঘ ১৪০৮। ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখে জাতীয় দৈনিক "আজকের কাগজ" এর ৭ম পাতায় ভাষা সৈনিক ও জামাতে ইসলামের সাবেক আমীর অধ্যাপক

www.pathagar.com

জনাব মো ঃ গোলাম আযম এর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। আজকের কাগজকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে "স্বাধীনতার পর অনেক দিন আপনি দেশে আসতে পারেননি। বংগবন্ধু শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় আপনি দেশে ফেরার সুযোগ পান। অনেকেই মনে করেন, আপনি শেখ মুজিব হত্যার একজন বড় বেনিফিশিয়ারি ?" এই প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, ঃ কেউ মনে করলে এটা তার নিজস্ব ব্যাপার। এটাতো ঠিক, শেখ মুজিব দেশটাকে যে দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে একনায়কত্বই কায়েম থাকত। শেখ মুজিব মারা গেলেও এই সিস্টেম চালু থাকলে সবাইকে এর দুর্ভোগ পোহাতে হতো। সে হিসেবে দেশের সকলেই বেনিফিশিয়ারি। গোটা দেশ শেখ মুজিব হত্যার পর ইন্নাল্লিাহ পড়েছে বলে প্রমান আছে ? জাতির পিতা মরলে কান্দে না হাসে ? তখন দেশবাসী উৎসব করেছে না কান্দাকাটি করেছে ? আমি তো লণ্ডনে ছিলাম। টাইমস্ পত্রিকায় খবর পড়েছি, "ইট ওয়াজ ফ্রাইডে, কারফিউ ওয়াজ ক্লেমড। এ্যাণ্ড ফর টু আওয়ার্স কারফিউ ওয়াজ ওইথড্রন টু ফেসেলেটেইড মুসলিম ফর ফ্রাইডে প্রেয়ার্স। পিওপলস্ অব হিউজ নাম্বার ইন সাচ মোর দে ওয়েন্ট টু দ্য মাস্ক, এজ ইফ দে আর গোয়িং টু অবর্জাভ এ ন্যাশনাল ফ্যাস্টিভাল।' লণ্ডনে তো মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনের একটা বড় কেন্দ্র ছিল। সেখানেও আমি মুজিবের পক্ষে একটা মিছিল দেখিনি। কেউ একটু দুঃখ প্রকাশ করেনি। তার সাড়ে তিন বছরের কুশাসনে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেল। *

দেশের সাধারন মানুষ যখন কোন রাষ্ট্রীয় অবস্থার কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে তখন সেই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য কোন হত্যা ঘটে থাকলে তা স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

——► শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

বুধবার ১লা ফাল্গুন ১৪০৮। ১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০০২ ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকায় জাতীয় অধ্যাপক, রাজশাহী ও জাহাংগীর নগর বিশ্বাবদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দ আলী আহসানের এক বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। বাংলা বাজার পত্রিকাকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে "একজন মানবতাবাদী ব্যাক্তিত্ব হিসেবে বংগবন্ধুকে স্পরিবারে হত্যার অধ্যায়টিকে আপনি কোন দৃস্টিতে বিচার করবেন ?" প্রশ্নের উত্তরে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, ঃ পৃথিবীতে কোন হত্যাই সমর্থনযোগ্য নয়। তবে কোন দেশের সাধারন মানুষ যখন কোন রাষ্ট্রীয় অবস্থার কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে তখন সেই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য কোন হত্যা ঘটে থাকলে তা স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সুতারাং শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিষয়টি ছিল সে ধরনের একটি ঘটনা।

দেশবাসী সে দিন তাদের বীর হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল পথে-ঘাটে স্বতঃস্ফুর্ত সমাবেশ ও হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

ভাষা সৈণিক সাদেক খান

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট যে ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন ঘটেছিল, তার স্মৃতি আজও জাতির মনে জাগরুক নাজাত দিবস হিসেবে। ব্যাক্তিকেন্দ্রীক একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষে যে অমানুষিক নির্যাতন, দঃশাসন ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষ "৭২ থেকে ৭৫" সাল মুজিব আমলের সাড়ে তিন বছর, তার থেকে আকস্মিক মুক্তিলাভ করেছিল দেশবাসী ঐদিন কিছু দেশপ্রেমিক সৈণিকের নেপথ্য উদ্যোগ ও দুঃশাহসিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বদৌলতে। কৃতংগ দেশবাসী সে দিন তাদের বীর হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল পথে-ঘাটে স্বতঃস্ফুর্ত সমাবেশ ও হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের জন্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ছিল অবশ্যই একটা মহামহিম ক্রান্তিলগ্ন। সেটা যে শুধু বাকশালী অনাচার-অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছিল তাই নয়, জাতীয় মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠারও সূত্রপাত ঘটিয়েছিল ঐদিন। (দৈনিক ইনকিলাব, ১৫-০৮-২০০০)

মুজিবের মৃত্যুতে এদেশের মানুষ চোখের পানি ফেলেনি, হয়নি শোকাবিভূত কিংবা প্রতিবাদমুখর।

অধ্যাপক ডঃ কে এ এম শাহাদৎ হোসেন মন্ডল

(সাবেক পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

মুজিবী শাসন থেকে দেশ ও জনগণকে উদ্ধারের জন্য সকলেই ছটফট করেছে। দেশবাসী মনে প্রাণে মুজিব শাসনের অবসান চেয়েছে দেশ ও জাতির অস্তিত্বের খাতিরে। জনগণের এককালের গগণচুম্বি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা হারিয়ে শেখ মুজিব একজন ব্যর্থ রাষ্ট্রনায়ক, বাকশালী স্বৈরশাসক ও একনায়কতন্ত্রের ধারক বাহক হিসেবে দেশবাসীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ছিল। এমনি অবস্থায় ১৫ই আগস্ট ৭৫ দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়। একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন একদলীয় শাসন বাকশালের অবসান ঘটে। শেখ মুজিবের মৃত্যুতে এদেশের মানুষ চোখের পানি ফেলেনি, হয়নি শোকাবিভূত কিংবা প্রতিবাদমুখর। এর কারণ হচ্ছে-১৫ই আগস্টের পট পরিবর্তনে দেশ ও দেশের জনগণ একটি ব্যর্থ প্রশাসন আওয়ামী অপশাসন, দুর্দশাগ্রস্ত এবং সর্বোপরি একদলীয় শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। এটি'ই ছিল মুখ্য দেশের জনগণের নিকট। মুজিবের রক্ত সেদিন জনগণের নিকট কোন বিবেচনায় আসেনি। শেখ মুজিবের মৃত্যু সেদিন জনগণের বিবেককে এতটুকুন বিচলিত করতে পারেনি। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। আজকে যারা শেখ হাসিনার চারপাশে মুজিব দরদী সেজে বসে আছেন তারাও সেদিন চোখের জল ফেলেনি। এর কারণ, সেই সময় তারাও মুজিব সরকারের মন্ত্রী কিংবা উপদেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে দেশের অবস্থার পরিবর্তন মনে প্রাণে চেয়েছিলেন। (সুত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৫-০৮-২০০০)

আজ জাতি চায় ফারুকের মত বীরের জন্ম হোক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নিবার্হী কমিটির সহ-সভানেত্রী, সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ও এম পি অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

www.pathagar.com

১৯৯৯ সালের ২রা আগস্ট বি এন পি'র কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বলেছিলেন, স্বাধীনতার পর বাকশালী দুঃশাসনে দেশবাসী যখন অতিষ্ঠ তখন কর্ণেল ফারুকের মত বীরেরাই বাংলাদেশকে বাঁচিয়েছিলেন। জাতির ক্রান্তিলগ্নে আজ জনগণ চায় ফারুকের মত একজন বীরের জন্ম হোক।
(সুত্রঃ দৈনিক ইনকিরাব, ০৩-০৮-১৯৯৯)

জনগণকে রক্ষার জন্যই ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবকে উৎখাত করা হয়েছে

——————▶ সাবেক তথ্যমন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ

১৯৮৯ সালের ২১-২৭শে আগস্ট প্রকাশিত সাপ্তাহিক বিক্রমকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সুবক্তা সাবেক তথ্যমন্ত্রী জনাব আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট যে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় তা কোন ভাবেই জনগনের সরকার ছিল না। সুতারাং ১৫ই আগস্টের ঘটনা একান্তভাবেই জনগনের ইচ্ছার প্রতিফলন। ১৫ই আগস্টের যারা বিরোধীতা করেন তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সম্পুর্ণ বিরোধী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য ১৫ই আগস্টের পরিণতি ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিত এবং এটা স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে। শেখ মুজিব পরিকল্পিতভাবে ৩৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছিল। রাজনৈতিক কর্মী হত্যা করেছে ৩৭ হাজার। সুতরাং তার পরিণতিটা ছিলো খুবই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক থাকার অবকাশ নেই। যদি কোন হত্যার বিচার চাইতে হয় তবে আওযামী লীগেরই বিচার করতে হবে আগে। কারণ, তারা ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে হাজার হাজার জনগণকে হত্যা করেছে। আর তাই জনগণকে রক্ষার জন্যই ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবকে উৎখাত করা হয়েছে।

১৫ই আগস্ট এদেশের জাতীয় জীবনে শান্তি-স্বস্তি ও পরিত্রান দিবস

——————▶ বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, দৈনিক গণকণ্ঠ সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ আফতাব আহমাদ

নশ্বর মানুষের উপর দেবত্ব আরোপ করে যে পৌত্তলিকতার সংস্কৃতি ও রাজনীতি এদেশে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুযারীর পর চালু করা হয়েছিল তার স্বাভাবিক অবসান ঘটে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫-এ। একদলীয় শাসনের নামে ব্যাক্তি ও বংশানুক্রমিক শাসনের যে পদক্ষেপ শেখ মুজিব নিয়েছিলেন, ১৫ই আগস্টের সুবহে সাদেকে তার অবসান ঘটে। তাই ১৫ই আগস্ট এদেশের জাতীয় জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও পরিত্রানের দিবস। এ দিবসের সংগে প্রাণের তাগিদে নাড়ির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সর্বসাধারনের। মুটে ও মুজুরের, কৃষক ও ভুমি চাষীর, সৈণিকের ও মধ্যবিত্তের। ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের অভিমুখে পুনঃযাত্রা করার এক নব জন্ম লাভ করে। জন্মের এই বার্তা জাতি সানন্দে ও প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করে। কোথাও ক্রন্দন বা মর্সিয়া ছিল না। মানুষ একে অপরকে আলিংগন করেছে যেমন নিস্কলুষভাবে ঈদের দিন একে অপরকে আলিংগন করে।
(সুত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব,১৫-০৮-২০০০)

www.pathagar.com

জাতি ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে

——————► সাবেক স্পীকার মালেক উকিল

১৫ই আগস্টের পট পরিবর্তন জাতির জন্য নবদিগন্তের সুচনা করেছিল

——————► সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু

ক্ষমতালিপ্সা শেখ মুজিবের পতনের কারণ

——————► খুশবন্ত সিং

শেখ মুজিবের পতনের জন্য শেখ মুজিব নিজেই দায়ী ছিল

——————► সানডে টাইমস

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এ জাতির জন্য নবদিগন্তের সুচনা করেছিল এবং জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনেদিয়েছিল। (সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মনজু'র মতে; দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক, উপসম্পাদকীয় ২৭ আগস্ট ও ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) ফলে সংগত কারণেই দেশ-বিদেশে এমনকি খোদ আওয়ামী লীগের এবং শেখ মুজিবের সর্বশেষ পয়দা বাকশালেরও অনেক নেতা কর্মী সেদিন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন। শেখ মুজিব সরকারের পার্লামেন্টের স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল শেখ মুজিব হত্যার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, "জাতি ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে"। শেখ মুজিবের পতনের জন্য শেখ মুজিব নিজেই দায়ী ছিল (সানডে টাইমস্ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫)। এছাড়া উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক-কলামিস্ট মিঃ খুশবন্ত সিং নিজ সম্পাদিত বহুল প্রচারিত ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইণ্ডিয়া'য় লিখেছিলেন, "নিজের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও জনমতকে উপেক্ষা করে চাটুকারদের উপর নির্ভরশীলতা শেখ মুজিবের পতনের প্রধান কারণ।" ৭৫ এর অক্টোম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত এসম্পর্কিত নিবন্ধটিতে মিঃ খুশবন্ত সিং আরো লিখেছেন, "শেখ মুজিবের স্ফীত অহমিকার সাথে যুক্ত হয় ক্ষমতালিপ্সা ও লোভ"। ফলে তার পতন অণিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। (দৈনিক দিনকাল, ১৫/৮/১৯৯৬)

কর্ণেল ফারুক-রশিদ-এর যদি বিচার করতে হয়-তাহলে তো জনগণকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয় ...

——————► দিনকাল সম্পাদক সানাউল্লাহ নূরী

মুজিব হত্যার বিচার প্রক্রিয়া জনগণ কিছুতেই ভালোভাবে নেবে না। ৭৫-এর প্রেক্ষাপট ছিল একেবারেই ভিন্ন রকম। ফারক-রশিদ-ডালিমরা প্রত্যক্ষভাবে কাজটি করেছে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এর পেছনে ছিল বিপুল জনগোষ্ঠির মৌন সমর্থন। তার প্রমান, ঐ ঘটনার পর কেউ প্রতিবাদ করেনি, মিছিল করেনি, এককোটা অশ্রু ফেলেনি কেউ। একদা যার জনপ্রিয়তা ছিল গগণস্পর্শী, তার মর্মান্তিক মৃত্যুতে জনগণের ভাবলেশহীন অভিব্যাক্তি, বিস্ময়কর বৈ কি ! কিন্তু এটাই হয়েছিল। এটাই সত্য। ৭২-৭৫ এর দুঃশাসনই এর কারণ। ঐ পর্বের দুঃশাসন, নৈরাশ্য, দুর্ভিক্ষের জন্য শেখ মুজিব দায়ী, নাকি তার অর্ধশিক্ষিত দুর্নীতিবাজ অনুসারীরাই দায়ী, সেটা

www.pathagar.com

বিশ্লেষণের ব্যাপার। তবে বাস্তব সত্য এই যে, ৭১ সালে যে জনগণ মসজিদে মসজিদে মুজিবের জন্য দোয়া করেছে,মানত করে তার জীবন ভিক্ষা চেয়েছে, তারাই ৭৪ সালে অহর্নিশ তার মৃত্যু কামনা করেছে। ৭২ সালের গোড়াতে যার ভাবমূর্তি ছিল হিমালয়ের মতো সুমহান, ৭৪ সালে তার জনপ্রিয়তা নেমে এসেছিল প্রায় শুণ্যের কোঠায়। অধিকিন্তু কোটি মানুষের পক্ষ থেকে বর্ষিত হচ্ছিল অভিশম্পাত। এমন একটি পরিস্থিতিই মুজিব হত্যার প্রেক্ষাপট নিমার্ণ করেছিল। জনগণ তো বটেই আওয়ামী লীগেরও এক বিরাট অংশ মুজিবের পতন কামনা করেছিল। এখন কর্ণেল ফারুক-রশিদের যদি বিচার করতে হয়, তাহলে তো জনগণকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয়, আওয়ামী লীগের অর্ধেক নেতা কর্মীকে শাস্তি দিতে হয়। এও কি সম্ভব ? (দৈনিক দিনকাল, ১৫/০৮/১৯৯৬)।

১৫ই আগস্টের পট পরিবর্তনের ফলে রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটে।

——————► প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রিয়াজ উদ্দিন আহমদ

সেদিন (১৫ই আগস্ট ৭৫) রাস্তায় এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, সরকার প্রধান নিহত হওয়ার প্রতিবাদে কোন মিছিল, বিক্ষোভ-সভা, শোকসভা কিছুই দেখা যায়নি। তখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। বিশেষ করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগেরই মন্ত্রীসভা বলতে গেলে গঠিত হয়-খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে। দেশে হঠাৎ করেই জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, মাস্তানি থেমে যায়। সাধারন মানুষের মনে স্বস্তি ফিরে আসে।

১৫ই আগস্টের পরিবর্তন জাতির জন্য প্রয়োজন ছিল

——————► বাকশাল নেতা মহিউদ্দিন আহমদ

দীর্ঘ সাড়ে তিন বছরের অত্যাচার, নির্যাতন ও লুটপাটের হাত থেকে ১৫ই আগস্ট জাতি মুক্তি পেয়েছিল। ১৫ই আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন জাতির জন্য প্রয়োজন ছিল। (দৈনিক দিনকাল, ১৫/৮/১৯৯৬)

@ ১৫ই আগস্ট ৭৫-এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে প্রবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বহির্বিশ্বে ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সংবাদবাহক ও বিলাতের সংগ্রাম কমিটি'র দফতর সম্পাদক বিলাত প্রবাসী জনাব শামসুল আলম চৌধুরীর বক্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। তাহল "শেখ মুজিব মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় সেনাবাহিনী, রিপেট্রিয়েট অফিসারবৃন্দ, রক্ষীবাহিনী এবং মুজিব বাহিনী দিয়ে একটি চর্তুর্ভুজ তৈরী করেছিলেন। এই চর্তুর্ভুজের প্রতি বাহু অন্য বাহুগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী অবস্থায় বিরাজ করছিল এবং পরিণতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং স্বপরিবারে (দু'জন বাদে) শেখ মুজিব স্বয়ং নিহত হন। (সুত্রঃ ইনকিলাব, ৯-০৮-২০০০)

- **শফিউল্লাহ সাক্ষী কেন তাকে আসামী করা উচিৎ ছিল।**

www.pathagar.com

→ বিচারপতি ফজলুল করিম

ছি! এটা কোন রায় হল!

→ বিচারপতি ফজলুল করিম

ছি! এটা অপরিপক্ক রায়। রায় যে ভাবে লেখে দায়রা জজ সে বিষয়টির অনুসরণ করা হয়নি। এটা কোন রায় হল! কাজী গোলাম রসুল যথার্থই কাজীর বিচার করেছেন। শুনলাম আর বিচার করলাম। কি শুনলাম আর কি বিচার করলাম সেদিকে খেয়াল নেই। এ রকম রায় জীবনে দেখিনি। একশ' বছর পরে দেখবেন এটা কোন রায় নয়। (শেখ মুজিব মামলায় তৃতীয় বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর নিম্ন আদালতের দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল কর্তৃক ঘোষিত রায় সম্পর্কে গত ২৫শে মার্চ উচ্চ আদালতে উপরোক্ত কথা বলেন।) ✶ ২৬শে মার্চ প্রকাশিত সকল জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকা দেখুন ✶

@ ৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাকশাল পতনের পর মনে হয়েছিল যে, সারা বাংলাদেশের মানুষ হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেছে।

→ নৌ পরিবহনমন্ত্রী কর্ণেল আকবর হোসেন

@ ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব বাকশাল ব্যাবস্থার মাধ্যমে পুরোপুরি ফ্যসিস্ট কায়দায় এক ব্যক্তির জঘন্যতম স্বৈরশাসন প্রবর্তন করেন। জনগণ মনে প্রানে এই সরকারের পতন কামনা করছিল। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাকে উৎখাত করার কোন পথ ছিল না। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এই সরকার উৎখাত হলো। .. .. কিন্তু জনগণ তখন এতই মুজিব বিরোধী ছিল যে, তারা এই পরিবর্তনকে সমর্থন করে।.. .. গোটা সামরিক বাহিনীও তা সমর্থন করে। বেশির ভাগ বিরোধী দল খুশিই হয়েছিল।

→ বামনেতা হায়দার আকবর খান রনো

@ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পরিবর্তনের পরে মনে হয়েছিল কাঁদ থেকে একটা জগদ্দল পাথর নেমে গেল।

→ সাংবাদিক নির্মল সেন (সাপ্তাহিক মেঘনাকে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে)

@ আওয়ামী লীগের লোকেরা বলেন শেখ মুজিবের মৃত্যু না হলে বাংলাদেশ হতো না। কিন্তু আমি বলি, শেখ মুজিবের মৃত্যু না হলে আমি মন্ত্রী হতে পারতাম না। কারণ, মুজিব একদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, তার কাছে বহুদলীয় গণতন্ত্রের কোন মূল্য ছিল না।

→ স্থানীয় সরকার উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু

(যায়যায়দিন, ০৫/০২/২০০২)

@ গণতন্ত্র চাইলে একদলীয় শাসন অবসানকারীদের ফাঁসি চাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

→ নৌ পরিবহনমন্ত্রী কর্ণেল আকবর হোসেন
(ভোরের কাগজ, ২২/০১/১৯৯৭)

◎ সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে অমান্য করে শেখ মুজিব মামলাটি দায়ের এবং এর কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।

→ এডভোকেট মাহবুবুর রহমান এমপি (দৈনিক সংগ্রাম, ১/২/২০০১)

◎ কাজী গোলাম রসুলের রায় কোন রায়ই হয়নি, মন্তব্য তৃতীয় বিচারপতির
(দিনকাল, ২৬/৩/২০০১)

◎ ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়েছিল কেবলমাত্র একদলীয় শাসন কায়েম ও দূর্নীতির কারনে নয়। পতন ঘটেছিল মূলত জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার জন্য।

→ বিশিষ্ট সাংবাদিক এলাহী নেওয়াজ খান

◎ আজ জনগণ চায় ফারুকের মত একজন বীরের জন্ম হোক।

→ অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

◎ শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করে ৭৫ এর জানুয়ারিতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

→ ঢাকা সিটি মেয়র সাদেক হোসেন খোকা

◎ ১৫ই আগস্ট একটি সফল বিপ্লব।

→ মজলুম জননেতা পীর মাওলানা ভাসানী

◎ আগস্ট বিপ্লবের নায়কেরা জাতির মহানায়ক।

→ মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ

◎ সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের ৩(এ) (৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ভাবেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদেরকে দেয়া অধিকার ও সুবিধা কোন আইন দ্বারা বাতিল করা যাবে না। সংবিধানের ৪র্থ তফসিল অনুচ্ছেদ (৩) এ উপ-অনুচ্ছেদ ৬ অনুসারে শেখ মুজিব হত্যার বিচার কার্যক্রম চলতে পারে না, ফলে আদালতে বিচারাধীন মামলার বিচারকার্য চলতে পারে না। নিম্ন আদালতের রায় আইনত বাতিল হবে। সংবিধান অনুসারে এই মামলা চলতে পারে না।

→ বিশিষ্ট আইনজীবি খান সাইফুর রহমান

www.pathagar.com

@ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানটি ছিল একটি সফল সামরিক অভ্যুত্থান।

→ অধ্যাপক ড ঃ তোজ্জাম্মেল হোসেন

@ বজলুল হুদার বিষয়ে সুপীম কোর্টে মিথ্যা রিপোর্ট পেশ, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। একটা দেশ এভাবে চলতে পারে না।

→ মাননীয় প্রধান বিচারপতি মাহমদুল আমীন চৌধুরী

@ শেখ মুজিব মামলায় আইনানুগ রায় প্রদান করা হয়নি।

→ সাবেক মন্ত্রী এডভোকেট মাহবুবুর রহমান এমপি

@ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একটি সফল বিপ্লব হয়েছিল।

→ লেঃ কঃ মোস্তাফা আনোয়ার

@ ১৫ই আগস্ট মহামুক্তির মহান দিবস।

→ কর্নেল (অবঃ) আনোয়ার হোসেন (বীর প্রতীক)

@ ১৫ই আগস্ট মুজিব শাহীর পতন হয়েছিল।

@ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বিপ্লব আর ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের ব্যালট বিপ্লবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

→ এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমেদ এমপি

@ ১৫ই আগস্ট সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড ঃ মাহবুব উল্লাহ

@ বাকশালী স্বৈরতন্ত্র উৎখাতের নিয়মতান্ত্রিক কোন পথই খোলা ছিল না।

→ নাসের ভাসানী

@ এদেশের মানুষ শান্তি প্রিয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে মুজিববাদী গুণ্ডাদের ভয়ংকর সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ দেশবাসী ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের প্রতি নীরব সম্মতি জানিয়েছিল। শেখ হাসিনার সন্ত্রাসী শাসনের বিরুদ্ধে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর দেশবাসী ঘটিয়েছে নীরব বিপ্লব।

যায়যায়দিন, ৫/৩/২০০২

@ চাটার দলের লুটপাট এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হবার পাশাপাশি রাষ্ট্র ক্ষমতায় একনায়কত্বের সৃস্টি

www.pathagar.com

হওয়ায় জনজীবন এক সীমাহীন দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হয়। জাতির এই চরম দুর্দিনে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশ জাতিকে আধিপত্যবাদের ক্রীড়নক পুতুল সরকারের খপ্পর থেকে মুক্তির জন্যে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে । বাকশালের সমাপ্তি ঘটে। দেশবাসী এবার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির পরিবর্তনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ("বহুদলীয় গনতন্ত্রের প্রবর্তক শহীদ জিয়া" থেকে)

- সামরিক আইন ঘোষণায় বলা হল সংবিধান "কার্যকর থাকবে; তবে অবশ্যই সামরিক আইন ঘোষণা ও সামরিক আইনের বিদিসমুহ ও আদেশসমুহের অধীনে। সংবিধান কার্যকর ছিল, যদিও খন্দকার মোশতাক আহমদ ঘোষিত সামরিক আইনের অধীনে সংবিধানের কিছু বিধি যোগ, বিয়োগ, পরিবর্তন, সংশোধন করার সুযোগ ছিল। ভবিষ্যতে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের ভোট সমর্থিত হবে এমন একটা ভ্যালিডেশন অভ র‍্যাটিফিকেশন অ্যাক্ট-এর সম্ভাবনার বলেই শুধু সংশোধনীগুলো আনা যেত। জনগণ কর্তৃক সংশোধনীগুলো সমর্থিত হবে এমন ক্ষেত্রেই শুধু র‍্যাটিফিকেশন অ্যাক্ট প্রত্যাশা করা যেত।

——————▶ সাবেক প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাদাতমোহাম্মদ সায়েম
(সুত্রঃ বংগভবনের শেষ দিনগুলি পৃঃ২৮ ও ৩৪)

- **৭২ পরবর্তী আওয়ামী- বাকশালীদের দুস্কর্মে জনগণ এতটাই বীতশ্রদ্ধ ছিল যে, ৭৫ এর ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর কেউ মাঠে নামার মত যৌক্তিক কোন কারণ খুঁজে পায়নি।**

——————▶ মোহাম্মদ আবু রুশদ (সুত্রঃ দেশনায়ক শহীদ জিয়া)

www.pathagar.com

একটি ডকুমেন্ট আনতে ব্যয় হয়েছে ১৩৫ কোটি টাকা

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয় বহুল মামলা হচ্ছে মুজিব হত্যা মামলা এ পর্যন্ত ব্যয় হাজার কোটি টাকা

এম এ নোমান ঃ বিশ্বে এযাবতকালের সবচেয়ে ব্যায় বহুল মামলা হচ্ছে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন শেখ মুজিব হত্যা মামলা। সুপ্রিম কোর্টের প্রবীন আইনজীবী ও বিশ্বের খ্যাতিমান আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, শেখ মুজিব হত্যা মামলার পেছনে রাষ্ট্র যে পরিমান অর্থ ব্যায় ও জনবল নিয়োগ করেছে বিশ্বের কোথাও এখন পর্যন্ত তা হয়নি। এ ধরনের ব্যয়বহুল মামলার নজির বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। তাছাড়া নিম্ন আদালতের রায় ঘোষণার ব্যাপারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিচারকের উপর সীমাহীন চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে বলেও আইনজীবীগন মনে করছেন। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পর শেখ মুজিব হত্যা মালার বিচার কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত এ মামলার পেছনে সহস্রাধিক কোটি টাকার উপরে খরচ করা হয়েছে। এ মামলাকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করেছে। **মামলায় অভিযুক্ত মেজর বজলুল হুদাকে থাইল্যান্ড থেকে দেশে ফেরত আনতে প্রায় ৩শ' কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে**। শেখ হাসিনার সরকার থাইল্যান্ড সরকারকে বারিধারার কুটনৈতিক পল্লীতে ৫০ কোটি টাকা মুল্যমানের ৫ বিঘা জমি প্রদান করেছে। তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ফুল টিম নিয়ে বিশেষ বিমানে থাইল্যান্ডে চারবার গেছেন। মামলার জন্য বিদেশ থেকে ডকুমেন্ট ক্রয় বাবদ একশ পয়ত্রিশ কোটি টাকা নেয়া হয়েছে। তাছাড়া থাইল্যান্ড সরকারকে আইনি সহায়তা প্রদানের জন্যও প্রায় ৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। মামলার এজাহার ভুক্ত পলাতক আসামীদের ধরার জন্য তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিশেষ টিম নিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০টি দেশে সফর করেছেন। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, সৌদি আরব, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে তারা একাধিকবার সফর করেছেন। পলাতক আসামীদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য বিশ্বের প্রভাবশালী পত্রিকাগুলোতে ছবিসহ বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। বিভিন্ন দেশে পোষ্টারিংও করা হয়। এতে প্রায় একশ কোটি টাকা ব্যায় হয়। আসামীদের জন্য শেখ হাসিনার সরকার আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের সহায়তা নিতে গিয়ে রাষ্ট্রের প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করেন। এ সংস্থার মাধ্যমে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সবগুলো দেশে রেড এলার্ট পাঠানো হয়। এ মামলা পরিচালনার জন্য শুরু থেকেই রাষ্ট্রপক্ষে ২০ জন আইনজীবী নিয়োগ করা হয়। এদের মধ্যে থেকে অধিকাংশই আদালতে হাজির থাকতেন না। ১৯৯৮ সালের ৮ই নভেম্বর ঢাকা জেলা দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল রায় প্রদান করেন। এতে তিনি ১৫ জনকে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান করেন। **শেখ হাসিনার সরকার কাজী গোলাম রসুলকে গুলশানে ৫ কাঠার একটি প্লট বরাদ্দ দিয়েছে**। অবশ্য পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগের একটি একক বেঞ্চ কাজী গোলাম রসুলের এ রায়কে কাজীর বিচারের সাথে তুলনা করেছে। উক্ত বেঞ্চ আরো বলেছে যে, **মূলত এটা কোন রায়ই নয়। এটা একটা থিসিস। ইতিহাসে নাম লেখানোর জন্যই কাজী সাহেব এ রায় প্রদান করেছেন**। মামলার নথিপত্র ও রায়ের সাথে কোনো সামঞ্জস্য ছিলো না বলে উক্ত বেঞ্চ এক মন্তব্যে উল্লেখ করেছে। আইনজীবীগন মনে করছেন, নিম্ন আদালতের রায়ের ব্যাপারে তৎকালীন সরকারের প্রত্যক্ষ চাপ

www.pathagar.com

ছিলো। তাছাড়া সরকার এ মামলাকে দেখিয়ে কোটি কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি আত্মসাত করেছে। একজন খ্যাতিমান আইন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, শেখ মুজিব হত্যা মামলার ব্যাপারে রাষ্ট্র যে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে অন্যান্য কোনো মামলায় তার শতকরা একভাগও দেয়া হয়নি। এ মামলার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি তদন্ত হওয়া অতি জরুরী বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ মামলার কাজে কিছু কিছু লোক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গিয়ে রঙ্গিন আলোর নিচে রাত কাটিয়ে দেশের কোটি কোটি টাকা নষ্ট করেছে। **সুত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ৬ ই নভেম্বর ২০০১।**

সাংবিধানিকভাবে অবৈধ শেখ মুজিব মামলায় কারাগারে আটক সকল দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবিলম্বে মুক্তি দানের জন্য জাতীয় সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণের অনুরোধ

মো : নুরুল হুদা ডিউক

(সাবেক এম পি মেজর (অব:) বজলুল হুদার ভাই)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলীসমূহের মধ্যে ৩ক। (১) বিধানে (কতিপয় ফরমান বৈধকরণ ইত্যাদি) এ বলা হয়েছে- ১৯৭৫ সালের ২০ শে আগস্ট এবং ৮ ই নভেম্বরের ফরমানসমুহ ও ১৯৭৬ সালের ২৯ শে নভেম্বরের তৃতীয় ফরমান, এবং উহাদের সংশোধনকারী বা সম্পূরক অন্যান্য সকল ফরমান ও আদেশ, অত:পর যাহা এই অনুচ্ছেদে সমষ্টিগতভাবে উক্ত ফরমানমুহ বলিয়া উল্লেখিত, এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে উক্ত ফরমানসমুহ বাতিল ও সামরিক আইন প্রত্যাহার করিবার তারিখের (উভয় দিনসহ) মধ্যে, অত:পর যাহা এই অনুচ্ছেদে উক্ত সময় বলিয়া উল্লেখিত, প্রণীত সকল সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ এবং অন্যান্য আইন বৈধরুপে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে, অথবা উহাদের নিকট, কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উথাপন করা যাইবে না। প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদ কর্তৃক জারীকৃত ও স্বাক্ষরিত ২০ শে আগস্ট ৭৫ এর ফরমানটির আইনগত বৈধতা দেয়া হয়েছে গণ প্রজাতন্তী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ৩ক। (১) বিধানে। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ৩ক। (১) বিধানে ২০ শে আগস্টের ফরমান সম্পর্কে কোন আদালতে বা ট্রাইব্যুনালে অথবা তাদের নিকট কোন কারনেই কোন প্রশ্ন উথাপন করা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৫০ অনুচ্ছেদের ৩ক। (১) বিধান যতদিন বাতিল কিংবা সংশোধন করা না হবে তত দিন পর্যন্ত ২০ শে আগস্টের ফরমান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কোন আদালতে তোলা যাবে না। ১৫ই আগস্ট জনগনের আশা আকাংখার প্রতীক দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনীর নেতৃত্বে সংঘটিত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন পর্বে সেনা বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা-সহ আওয়ামী-বাকশালী অনেক নেতা জড়িত ছিলেন। আর এই সব ব্যাক্তিদের কর্মকাণ্ডকে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমাদ সংবিধানের

www.pathagar.com

৪৬ ও ৯৩ (১) অনুচ্ছেদের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারী করে সাংবিধানিক বৈধতা দেন। এই বৈধতা বিগত আওয়ামী সরকার বাতিল করেছে ১৯৯৬ সালের ২১ নং আইন দ্বারা। ইনডেমনিটি বিল বাতিলের প্রেক্ষাপটে দায়েরকৃত শেখ মুজিব মামলায় তৎকালীন সময়ে সেনা বাহিনীতে কর্মরত যে সব কর্মকর্তাকে শেখ মুজিব মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে তাদেরকে সাংবিধানিকভাবে অভিযুক্ত করা যায় না। যতদিন পর্যন্ত আমাদের জাতীয় সংবিধানে ১৫০ অনুচ্ছেদের ৪র্থ তফসিলের ৩ (ক) বিধান বিদ্যমান থাকবে, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা সাংবিধানিক ভাবে অবৈধ বিবেচিত হবে। শুধু তাই নয়-আমাদের জাতীয় সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৪র্থ তফসিলের ১৮ বিধান বিদ্যমান রয়েছে। ১৯৭৯ সালের ৫ ই এপ্রিল সংবিধান সংশোধনের সময় এই বিধানটি সংবিধানের অংশ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে যতদিন ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৪র্থ তফসিলের ১৮ বিধান বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত ১৫ই আগস্ট থেকে ৯ ই এপ্রিল ৭৯ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না কোন আদালতে। সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বিল নামে যে বিলটি ২৪৩ ভোটে পাশ হয়- তা এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

চতর্থ তফসিল (১৫০ অনুচ্ছেদ) ফরমানসমুহ, ইত্যাদির অনুমোদন ও সমর্থন ঃ

১৮/১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ ই এপ্রিল তারিখের (উভয় দিন-সহ) মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরুপ কোন ফরমান দ্বারা এই সংবিধানে যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপ সাধন করা হইয়াছে তাহা এবং অনুরুপ কোন ফরমান, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোন আইন হইতে আহরিত বলিয়া বিবেচিত ক্ষমতা বলে অথবা অনুরুপ কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গিয়া বা অনুরুপ বিবেচনায় কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করিবার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন ব্যাক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কৃত কাজকর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমুহ অথবা প্রণীত, কৃত বা গৃহীত বলিয়া বিবেচিত আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমুহ এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং ঐসকল আদেশ, কাজকর্ম, ব্যাবস্থা বা কার্যধারাসমুহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

জাতীয় সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিস্ট ৪র্থ তফসিলের ৩ (ক) ও ১৮ বিধান-এ প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোস্তাক আহমাদ কর্তৃক জারীকৃত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকার কারণেই সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েই ইনডেমনিটির কার্য-ক্ষমতা বাতিল ঘোষণা করা সম্ভব হয়েছে। ইনডেমনিটি বাতিল বিল বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে মাননীয় হাইকোর্ট এবং মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ। সাবেক প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ জাতীয় সংবিধানের ৪৬ ও ৯৩ অনুচ্ছেদের কার্য-ক্ষমতা বলে যে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারী করেন সেই ইনডেমনিটি বিল (অধ্যাদেশ) বাতিলের সাথে সংবিধান সংশোধনের যে প্রশ্ন

www.pathagar.com

জড়িত ছিল বলে জনমনে যে ধারণা হয়েছিল, সেই ধারনার অবসান ঘটেছে। ইনডেমনিটি বিল বাতিলের পর ও শেখ মুজিবর রহমান প্রসংগটি কোন আদালতে উত্থাপন করার অধিকার সাংবিধানিকভাবে কারো নেই। কেননা সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৪র্থ তফসিলের ১৮ বিধানে ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ৯ ই এপ্রিল ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সকল ফরমান, আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশের বলে সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপ সাধন করা হয়েছে তা বৈধ ভাবে করা হয়েছে বা গ্রহণ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কোন আদালতে তোলা যাবে না বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৪র্থ তফসিলের ১৮ বিধানে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ৭৯ সালের ৯ ই এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সকল ফরমান জারী করা হয়েছে, সেই সকল ফরমান বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ৭৯ সালের ৯ ই এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সকল ফরমান জারী করা হয়েছে, সে সব ফরমানের মধ্যে দু'টি ফরমান জারী করা হয় ১৫ই আগস্ট সংঘটিত ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করে। ২০ শে আগস্ট ৭৫, ৮ ই নভেম্বর ৭৫ এ জারীকৃত ফরমানে ১৫ই আগস্ট সংঘটিত ঘটনাবলীর বৈধতা দেয়া হয়েছে। আর এই ফরমান দু'টির বৈধতা দেয়া হয়েছে সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের ৩(ক) এবং ১৮ বিধানে। এই ১৮ বিধানটি সরাসরি সংবিধান সংশোধনী বিল। খন্দকার মোশতাক আহমেদের জারীকৃত ইনডেমনিটি বিল আওয়ামী লীগ সরকার বাতিল করতে পারলেও সংবিধান সংশোধনী এই বিলটি বাতিল করতে পারেনি। কাজেই আমাদের সংবিধানে ১৫০ অনুচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট ৪র্থ তফসিলের ৩(ক) ও ১৮ বিধান বিদ্যমান থাকাকালীন সময়ে কোন আদালতে ১৫ই আগস্ট ৭৫ থেকে ৯ ই এপ্রিল ৭৯ সাল পর্যন্ত জারীকৃত ফরমান সমূহ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। ১৫ই আগস্ট ৭৫ ঘটনাবলীর বৈধতাকে কেন্দ্র করে জারীকৃত ফরমান সমূহ সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করার কোন সুযোগ সাংবিধানিকভাবে না থাকায় শেখ মুজিব মামলা গ্রহণ করার কোন প্রকার এখতিয়ার ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নেই। সুতারাং মুজিব মামলার রায় ঘোষণার প্রশ্নও আইনতঃ অবান্তর। ##

যে কোন মামলা প্রত্যাহারে সরকারের ক্ষমতা

ফৌজদারী কার্যবিধির ভাষ্য

.....গাজী শামসুর রহমান

উনত্রিংশ অধ্যায়

ধারা ঃ ৪০১। দন্ড স্থগিত অথবা মওকুফ করিবার ক্ষমতা ঃ

www.pathagar.com

(১) কোন ব্যক্তি অপরাধের জন্য দন্ডিত হইলে সরকার যেকোন সময় বিনাশর্তে বা দন্ডিত ব্যক্তি যাহা মানিয়া লয় সেইরূপ শর্তে যে দণ্ডে সে দন্ডিত হইয়াছে, সেই দন্ডের কার্যকরীকরণ স্থগিত রাখিতে বা সম্পূর্ণ দন্ড বা দন্ডের অংশ বিশেষ মওকুফ করিতে পারিবেন।

(২) যখন দন্ড স্থগিত রাখা বা মওকুফ করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হয়, তখন যে আদালত উক্ত দন্ড দিয়াছিলেন বা বহাল করিয়াছিলেন সেই আদালতের হাকিমকে সরকার উক্ত আবেদন মঞ্জুর করা উচিত, না প্রত্যাখ্যান করা উচিত, সেই সম্পর্কে তাহার মতামত ও মতামতের কারণ বিবৃতির সহিত বিচারের নথিপত্র বা যে সমস্ত নথিপত্র বর্তমান রহিয়াছে, সেই সমস্ত নথিপত্র প্রেরণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) যে সমস্ত শর্তে দন্ড স্থগিত রাখা বা মওকুফ করা হইয়াছে, তাহার কোনটি পালন করা হয় নাই বলিয়া মনে করিলে সরকার দন্ড স্থগিত বা মওকুফের আদেশ বাতিল করিতে পারিবেন এবং অতঃপর যে ব্যক্তির দন্ড স্থগিত রাখা বা মওকুফ করা হইয়াছিল সে মুক্ত থাকিলে যে কোন পুলিশ অফিসার তাহাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং তাহার দন্ডের অনতিবাহিত অংশ ভোগ করিবার জন্য তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা যাইবে।

(৪) এই ধারা অনুসারে যে শর্তে কাহারো দন্ড স্থগিত রাখা বা মওকুফ করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি অথবা তাহার ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে সেই শর্ত পালন করিতে হইবে।

(৪- ক) এই বিধি বা অপর কোন আইনের কোন ধারা অনুসারে ফৌজদারী আদালত আদেশ দান করিলে তাহা যদি ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করে, অথবা তাহার বা তাহার সম্পত্তির উপর কোন দায় আরোপ করে, তাহা হইলে উপরিউক্ত উপধারা সমূহের বিধান এই আদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

৫ প্রেসিডেন্টের অনুকম্পা প্রদর্শন ও দন্ড স্থগিত রাখা বা কার্যকরীকরনে বিলম্ব ঘটানো বা মওকুফ করিবার অধিকার এই ধারার কোন বিধান ক্ষুন্ন করিতে পারিবে না।

(৫-ক) প্রেসিডেন্ট শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমা মঞ্জুর করিলে উক্ত শর্ত যে প্রকৃতিরই হোউক না কেন, উহা এই আইন অনুসারে কোন উপযুক্ত আদালতের দন্ড দ্বারা আরোপিত শর্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই অনুযায়ী কার্যকরীকরণের যোগ্য হইবে।

(৬) সরকার সাধারণ বিধিমালা বা বিশেষ আদেশ দ্বারা দন্ড স্থগিত রাখা এবং আবেদনপত্র দাখিল ও বিবেচনার শর্তাবলী সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

ভাষ্য ঃ যে কোন অপরাধের শাস্তির ব্যপারে এ ধারা প্রযোজ্য। সরকার আদেশ বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারেন যদি তা কার্যকর করা না হয়ে থাকে {PLD. 1955 Lah. 65.}| এ ধারার ক্ষমতা কেবল সরকারের উপর ন্যস্ত। কোন মন্ত্রীর উপর নয়। এ ধারা বলে সরকার আংশিক বা সম্পূর্ণ জরিমানার আদেশ মওকুফ করে দিতে পারেন, তবে জরিমানার অন্যথায় কারাবাসের আদেশ হয়। এ ধারা অনুযায়ী সরকার সাধারণ ক্ষমতার অংশ হিসাবে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে মুক্তি দিতে পারেন। এতে হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে বলে ধরা যায় না। (1955 Mad92.)

www.pathagar.com

সরকারের ক্ষমতা ঃ আদালত শুধুমাত্র দণ্ডাদেশ প্রদান করার সাথে সম্পর্কিত। তা কার্যকর করা নিবাহী সরকারের কাজ। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তার দন্ড মওকুফ অথবা স্থগিত করার আদেশ করবেন কিনা তা নিধ্যারণের ক্ষমতা তাদের। (PLD 1965 Quetta 15 DB) ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ ধারা মোতাবেম সংবিধানের অধীনে নিবাহী বিভাগের উপর যে রাজকীয় ক্ষমতা তাতে হস্তক্ষেপ করা আদালতের উচিৎ নয়।
(PLD 1965 wp Quetta 15 DB)

আদেশ প্রত্যাহার ঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১ ধারার অধীনে যে আদেশ দেয়া হয় তাতে জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্টের ২১ ধারা প্রযোজ্য হয়। এবং এ ধারার অধীনে আদেশ সরকার প্রত্যাহার করতে পারেন। (১৭ DLR wp ৯১) সরকার বিশেষ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে বিশেষ দণ্ড মওকুফ করেন তা জেল ম্যানুয়েলের আওতায় পড়ে না। এবং এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি এককভাবে ব্যাবহার করতে হয়। (PLD 1979 Lah.340)

ধারা ঃ ৪০২-ক। সরকারকে ৪০১ ধারা অনুসারে যে ক্ষমতা অপর্ণ করা হইয়াছে, তাহা মৃত্যু, মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিও প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

ভাষ্য ঃ দণ্ডাদেশ দিবার অধিকার একমাত্র আদালতের। সে দণ্ড কার্যকরী করা, স্থগিত করা, মওকুফ করা, হ্রাস করা, বিলম্ব করা প্রভুতি কাজের অধিকার দুই স্থলে বিরাজমান সরকার এ অধিকার রাখে, আবার রাষ্ট্রপতিও এ অধিকার রাখে। এ অধিকার বলে প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার করা যায়। কিন্তু আদেশের বলে আসামীর কাছে ফায়দা পৌছে থাকলে অতঃপর প্রত্যাহারের অধিকার প্রয়োগ করা যায় না। এ অধ্যায় অনুযায়ী সরকার কিংবা রাষ্ট্রপতি দণ্ডাদেশ হ্রাস প্রভৃতি করার হুকুম দিতে পারেন, জেল কর্তৃপক্ষের এরূপ অধিকার নেই।

@@@@@@

শেখ মুজিব মামলার বিচারের সাথে সংশ্রিষ্ট বিচারপতি সম্পর্কে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতা-নেত্রীরা যে সব বক্তব্য রেখেছে তা এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

- হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত লাঠি মিছিল চলবে। ... . মো ঃ নাসিম (সাবেক স্বরাষ্টমন্ত্রী)
- খুনিদের বিচার করে বিজয় উৎসব করব। .. .. .. আব্দুর রাজ্জাক (সাবেক পানি সম্পদমন্ত্রী)
- বিচার করতে যে বিচারকরা বিব্রতবোধ করেন তাদের আদালতের পবিত্র ঘর ছেড়ে যাওয়া উচিৎ। ... .. সাজেদা চৌধুরী (সাবেক বন ও পরিবেশ মন্ত্রী)
- গোলাম আযমের নাগরিত্ব দিতে বিচারকরা বিব্রত হন না কিন্তু বংগবন্ধু হত্যা মামলার বিচার করতে তারা বিব্রত হন এটা লজ্জার বিষয়। প্রয়োজনে জনগণকে নিয়ে বিচারকদের বাড়ী ঘেরাও করা হবে।.. .. আওয়ামী লীগের ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক মুকুল বোস
- বিচার করতে যে বিচারকরা বিব্রত হন, দায়িত্ব অবহেলার জন্য তাদের বিরুদ্ধেই আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হবে।.. .. .. যুব লীগের সাধারন সম্পাদক এডভোকেট কাজী ইকবাল

www.pathagar.com

- বিচার করতে যারা বিব্রত হন বিচারকের আসনে বসার অধিকার তাদের নেই। .. .. ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এডভোকেট কামরুল ইসলাম।
- বিব্রতবোধকারী বিচারকদের সরিয়ে বিচার করতে পারেন এমন বিচারকদের বসাতে হবে। যে বিচারকরা সামরিক শাসন বৈধ করার ক্ষেত্রে বিব্রতবোধ করেন না তারাই বংগবন্ধু হত্যার বিচারের রায়ের শুনানী গ্রহণ করতে বিব্রতবোধ করেন-এটা আমরা মানতে পারি না।.. ... . আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী সাজেদা চৌধুরী
- আপীলের শুনানী না হলে এরপর লাঠি মিছিল হবে না, লাঠি কোথায় মারতে হয় আওয়ামী লীগ দেখিয়ে দেবে। ২০০০ সালের ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে বংগবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকর করা হবে। .. .. মোহাম্মদ নাসিম (সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী)
- বংগবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকর করেই ছাড়বো। .. .. .. সাজেদা চৌধুরী
- ষড়যন্ত্রকারীরা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন এ দেশের মাটিতেই জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় কার্যকর করা হবে।.. .. .. শেখ হাসিনা (সাবেক প্রধান মন্ত্রী)
- প্রতিটি সামরিক শাসনকে নির্লজ্জভাবে সমর্থন করেছেন প্রধান বিচারপতিরা। তাদের লজ্জা করে না নামের সাথে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি লিখতে।.. .. .. শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সুরনজিত সেনগুপ্ত
- বংগবন্ধুর আত্মস্বীকৃত ঘাতকদের বিচারের জন্য সাক্ষী শুনানীর প্রয়োজন নেই। .. .. মোহাম্মদ নাসিম
- আমরা খুনীদের বিচার করবোই করব। আদালতকে প্রভাবিত করে হলেও বিচার করা হবে। .. .. আব্দুর রাজ্জাক
- বিচারপতিদের কর্মকান্ডই হচ্ছে সরকারকে বিব্রত ও অসহযোগিতা করা। .. .. আবদুল জলিল (সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী)
- সাজাপ্রাপ্ত ১৫ জনের মধ্যে ৫ জনকে খালাস দেয়া হয়েছে। আমরা এ রায় মানি না। .. .. জিল্লুর রহমান
- পাঁচ ঘাতককে যিনি ছেড়েছেন তিনি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছেন। .. .. মতিয়া চৌধুরী (সাবেক কৃষি মন্ত্রী)
- আইন নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। .. .. .. শেখ ফজলুল করিম সেলিম (সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী)
- শেখ মুজিব হত্যা মামলার রায় ঘোষণার ৭ দিনের মধ্যে ফাঁসি কার্যকর করা হবে। .. .. মহিলা আওয়ামী লীগ
- মুজিব হত্যাকারীদের ফাঁসির রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। ... .. আওয়ামী যুব লীগ
- মুজিবের আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিচারের রায় বাংলার মাটিতেই কার্যকর করা হবে। .. .. ছাত্রলীগ
- কোন কথা শুনতে চাই না শেখ মুজিবের সকল হত্যাকারীর ফাঁসি চাই। .. .. মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরী মায়া

www.pathagar.com

- বাংলার মাটিতেই বংগবন্ধুর খুনীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হবে। .. .. জিল্লুর রহমান

@ ফুটনোট ঃ হাসিনা ও তার দলের নেতা কর্মীরা যে সব বক্তব্য রেখেছে বিচারপতিদের সম্পর্কে তাতে করে তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের হওয়া উচিৎ ছিল। মুজিব মামলার শুরু থেকে তারা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর সীমাহীন নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে। অবশ্যই তাদের বিচার হওয়া উচিৎ । মুজিব মামলায় প্রভাব ফেলতে ও বিচারপ্রতিদের ভয় দেখাতে হাসিনা ও আওয়ামী নেতারা যা করেছে তার তথ্য প্রমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে ?

জাতির জাগ্রত বিবেকের কাছে প্রশ্ন ?

ফোকাস ঃ ২৮/ ০৯/ ২০০১ তারিখে পল্টনে আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী জনসভায় দেশবাসীর প্রতি শেখ হাসিনা আবেদন ঃ এবার ভোট ভিক্ষে দিন, বংগবন্ধুর খুনীদের ফাঁসির রায় কার্যকর করব।

ফোকাস ঃ ১লা অক্টোবরে নীরব ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে দেশবাসী হাসিনার আবেদনের চরম জবাব দিয়েছে।

ফোকাস ঃ এরপরও শেখ মুজিব মামলা প্রত্যাহার না করে আগস্ট বিপ্লবের মহানায়কদের কারাগারের কনডেম সেলে আটক রাখা দেশবাসীর নীরব ব্যালট বিপ্লবের সাথে বেইমানী নয় কী ?

মাওলানা ভাসানীই বাংলাদেশের স্বাধীনতার রুপকার ও স্থপতি

——————→ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া

(সুত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৭-১১-২০০০)

@ জেনারেল জিয়া হত্যার নেপথ্যে শেখ হাসিনার হাত ছিল বললে কি ভুল হবে ? কারণ শেখ হাসিনা দেশে ফেরার দুই সপ্তাহের মধ্যে জিয়া নিহত হন। এরপর আওয়ামী লীগের পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে দেশে সামরিক শাসনকে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

——————→ বি এন পি এম পি কর্ণেল আকবর হোসেন

www.pathagar.com

@ শেখ হাসিনা অসম্ভব রাগী এবং একরোখা। কখন কাকে কি বলবে ঠিক থাকে না। তার নিজের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া

স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, রূপকার, স্থপতি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের জনক, রাষ্ট্রপিতা মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান,অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামী নেতা শহীদ সিরাজ সিকদার এর আদর্শ, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ও ৭ই নভেম্বরের ঐতিহাসিক সিপাহী বিপ্লবের লক্ষ, উদ্দেশ্য ও চেতনা গণমানুষের সামনে তুলে ধরে একুশ শতকের আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃপ্ত অংগীকার নিয়ে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক ফোরাম এর আত্মপ্রকাশ।

www.pathagar.com